বিজ্ঞান (www.bigyan.org.in) – এর কিছু
বাছাই লেখার সংকলন

বিজ্ঞান পত্রিকা

দ্বিতীয় সংখ্যা | জানুয়ারী ২০১৬

বিজ্ঞানের খবর

জলের দামে মাইক্রোস্কোপ

দৈনন্দিন জীবনে রসায়ন

লঙ্কাকান্ড

কিছু ইতিহাস

পাখিপ্রাণ সালিম আলি

বিস্ময়ের জীবজগৎ

পেখম রহস্য

আরো থাকছে - অন্যান্য প্রবন্ধ!

যারা বিজ্ঞান ভালবাসে, বা
ভয় পায় তাদের জন্য ...

বিজ্ঞান পত্রিকা

দ্বিতীয় সংখ্যা
জানুয়ারী, ২০১৬

www.bigyan.org.in-এর বাছাই করা লেখার সংকলন

'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জানতেঃ

ওয়েবসাইট - www.bigyan.org.in
ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

ইমেইল - bigyan.org.in@gmail.com

সূচীপত্র

জলের দামে মাইক্রোস্কোপ ০৬
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়
- অনির্বাণ ঘোষ

লঙ্কাকাণ্ড ১১
- পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবী

পেখম রহস্য ১৪
- অনিন্দিতা ভদ্র

পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে ১৮
- রাজীবুল ইসলাম

মহাবিশ্বের প্রথম আলো ২৩
- সুপ্রতীক পাল

খেলাচ্ছলে প্রোগ্রামিং ২৯
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

পাখিপ্রাণ সালিম আলি ৩৫
- মানস প্রতিম দাস

সম্পাদকীয়

'বিজ্ঞান পত্রিকা'-র দ্বিতীয় সংখ্যা বার করতে গিয়ে মনে হলো: কেন এই যাত্রাটা শুরু করেছিলাম আমরা, সেটা আরেকবার হয়তো ঝালিয়ে নেওয়া উচিত। আমাদের অসংখ্য বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকদের কাছে হয়তো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের জগৎ থেকে বঞ্চিত থাকা মানে জেনেশুনে একটা অন্য যুগে পড়ে থাকা। আর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা হয়, এমন মাধ্যম তো হাতে গোনা কয়েকটি! তাই, 'বিজ্ঞান'-এর প্রয়োজন কেন, সেই নিয়ে হয়ত প্রশ্ন নেই।

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়: ইন্টারনেট যুগে প্রিন্ট পত্রিকা কেন? তাও আবার এমন প্রিন্ট পত্রিকা যা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে প্রিন্ট করতে হয়? অনেকগুলো উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বলি।

বিজ্ঞান পড়বো কি পড়বো না, এই সিদ্ধান্তটা খুব কাঁচা বয়েসেই আমাদের নিয়ে ফেলতে হয়। সাধারণত, সেটা হয় দশম শ্রেণীর পর, যখন সাইন্স, আর্টস বা কমার্সের মধ্যে কোনো একটা বেছে নিতে হয়। একবার বিজ্ঞান বেছে নিলে, তারপর কলেজে ভর্তির সময় আরেকবার আসে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা। খুব মোটাদাগে বললে, এবার বিকল্পগুলো হলো ফলিত বিজ্ঞান (applied science)/ ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (pure science)। এই মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগুলো নেব, আমাদের অনেকের কাছেই তার স্পষ্ট জবাব থাকে না। ফলস্বরূপ, বিজ্ঞান বেছে নেওয়ার বা না নেওয়ার কারণগুলোর সাথে অনেক সময় বিজ্ঞানের সরাসরি সম্পর্ক থাকেনা। যেমন, পরীক্ষার হলে অঙ্ক নামাতে না পেরে অঙ্ক তথা সমগ্র বিজ্ঞানের ভীতি কিম্বা কিছু বিশেষ ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে মোটা মাইনের চাকরির আকর্ষণ। এই কারণগুলো আমাদের সমাজ বা শিক্ষাব্যবস্থার দিকে আঙ্গুল তুলতে পারে, কিন্তু এইসব কারণে কেউ যদি বিজ্ঞান বেছে নেয় বা ছেড়ে দেয়, সেটা আক্ষেপের বিষয়।

অপরদিকে, বিজ্ঞান গবেষকদের যদি জিজ্ঞাসা করেন, কখন তারা প্রথম বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছিলেন, উত্তরে কিন্তু তাদের অনেকেই চলে যাবেন তাদের কৈশোরে। কোনো একটা বই, কোনো একটা লেখা, কোনো একজন তাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল: "বাহ্, এইটা করা যেতে পারে তো!" সেটা হতে পারে কোনো এক বিজ্ঞানের পত্রিকায় বা খবরের কাগজের কোনো লেখা, রেডিও-র কোনো অনুষ্ঠান অথবা কোনো পপুলার সাইন্সের বই। অনেক ক্ষেত্রেই, কোনো অসাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষক কিম্বা শিক্ষিকা সেই ভূমিকা নেয়। কিন্তু, এমন একটা কিছুর সান্নিধ্যে যে সবাই আসবে, তার নিশ্চয়তা নেই। বিশেষ করে, ইংরাজিতে স্বচ্ছন্দ না হলে সেই সুযোগ আরো অনেকটা কমে যায়।

সেই অভাবের কথা মাথায় রেখেই 'বিজ্ঞান' ওয়েবসাইট এবং বিশেষ করে, 'বিজ্ঞান পত্রিকা'। শুধু নিজে পড়া নয়, আপনার চেনাপরিচিত ছাত্রছাত্রীদের যাতে পড়াতে পারেন, তার একটা সুযোগ করে দিতে চাই আমরা। আপনি যদি স্কুলের শিক্ষক কি শিক্ষিকা হন বা সন্তানের অভিভাবক হন, তাহলে এই প্রিন্ট-ফ্রেন্ডলি ফরম্যাটের পত্রিকা প্রিন্ট করে স্কুলের বুলেটিন বোর্ডে লাগাতে পারেন। বা অন্য কোনভাবেও ছাত্রদের কাছে পৌছে দিতে পারেন। পাঠ্যক্রমের বাইরে বৃহত্তর বিজ্ঞানের জগতের সাথে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। তবেই না তারা বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, বিজ্ঞানের রাস্তায় নামবে কিনা। আর ভালোবেসে কোনো কিছু বেছে নেওয়ার চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?

‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র দ্বিতীয় সংখ্যায় আমরা ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় থেকে একটা কি দুটো বাছাই লেখা তুলে ধরেছি। আশা করি বিজ্ঞানচর্চা কতটা মজাদার হতে পারে, তার এক ঝলক পাওয়া যাবে এখানে। যেমন, রসায়ন মানে শুধু সমীকরণ ব্যালান্স নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তা কতটা জড়িয়ে আছে, তা ‘লঙ্কাকাণ্ড’ পড়লে বোঝা যাবে। কেন জল খেলে লঙ্কার ঝাল জিভ থেকে যায়না, সেটাও কিন্তু রসায়ন। জীবন বিজ্ঞান মানে শুধুই হাজারটা নাম মুখস্থ নয়, ‘পেখম রহস্য’ সেটাই দেখায়। ময়ূরের বাহারি পেখম তো নেকড়ের জন্য আদর্শ, শিকার খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধেই নেই, অথচ বিবর্তনের ফলে পেখম হারিয়ে যায়নি কেন, সেটাও কিন্তু জীবন বিজ্ঞানের প্রশ্ন। পদার্থবিদ্যা শুধু বইয়ের পিছনে দেখে অঙ্কের উত্তর মেলানো নয়, তার সাহায্যে মানুষ যে আজ অজানার কোন সুদূর প্রান্তরে পাড়ি দিয়েছে, তার কিছুটা পরিচয় দিচ্ছে ‘পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে’ বা ‘মহাবিশ্বের প্রথম আলো’। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখতে যে হাজারটা ব্যাকরণ বা সিনট্যাক্স মনে রাখতে হয়না, তা দেখাচ্ছে ‘খেলাচ্ছলে প্রোগ্রামিং’। এর সাথে থাকছে কিছু ইতিহাস, বিজ্ঞানের খবর, ইত্যাদি। বিজ্ঞানের ওয়েবসাইটে আগে এই লেখাগুলো যারা পড়েছিলেন তারা এই সুযোগে আবার একবার পড়ে নিতে পারেন।

আর সারপ্রাইজ প্যাকেজ হিসেবে আছে ‘জলের দামে মাইক্রোস্কোপ’। প্রায় জলের দামে একটা মাইক্রোস্কোপ বানিয়ে সকলের কাছে পৌছে দেওয়ার এই প্রয়াসকে আমরা সেলাম জানাই। এটা কত উপযোগী আর সেই সাথে এটা বানাতে আবিষ্কারকদের কতটা সৃজনশীল হতে হয়েছে সেটাও আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা।

লেখাগুলো আমাদের খুবই পছন্দের। আশা করি, আপনাদেরও ভালো লাগবে।

সম্পাদকমন্ডলী, ‘বিজ্ঞান’
৩-রা জানুয়ারী, ২০১৬

‘বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনায় যারা আছি

- কুণাল চক্রবর্ত্তী (ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর)
- কাজী রাজীবুল ইসলাম ((ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় , কেমব্রিজ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- দিব্যজোতি ঘোষ (অ্যাডোবি, সান হোসে, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (ম্যাথওয়ার্কস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র; NGO পদক্ষেপ-এর সদস্য)
- অর্ণব রুদ্র (ট্রিনিটি কলেজ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ড; NGO পদক্ষেপ-এর সদস্য)
- শাওন চক্রবর্তী (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়)
- সুমন্ত্র সরকার (ব্র্যান্ডাইস ইউনিভার্সিটি, ম্যাসাচুসেটস)
- আবির দাস (ব্র্যান্ডাইস ইউনিভার্সিটি, ম্যাসাচুসেটস)
- কাজী ফারহা ইয়াসমিন (আই বি এম, কলকাতা)
- সূর্যকান্ত শাসমল (কগনিজেন্ট, কলকাতা)

‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র সম্পাদনা - সূর্যকান্ত, অর্ণব, অনির্বাণ, কুণাল ও রাজীবুল।

প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নকশা - সূর্যকান্ত

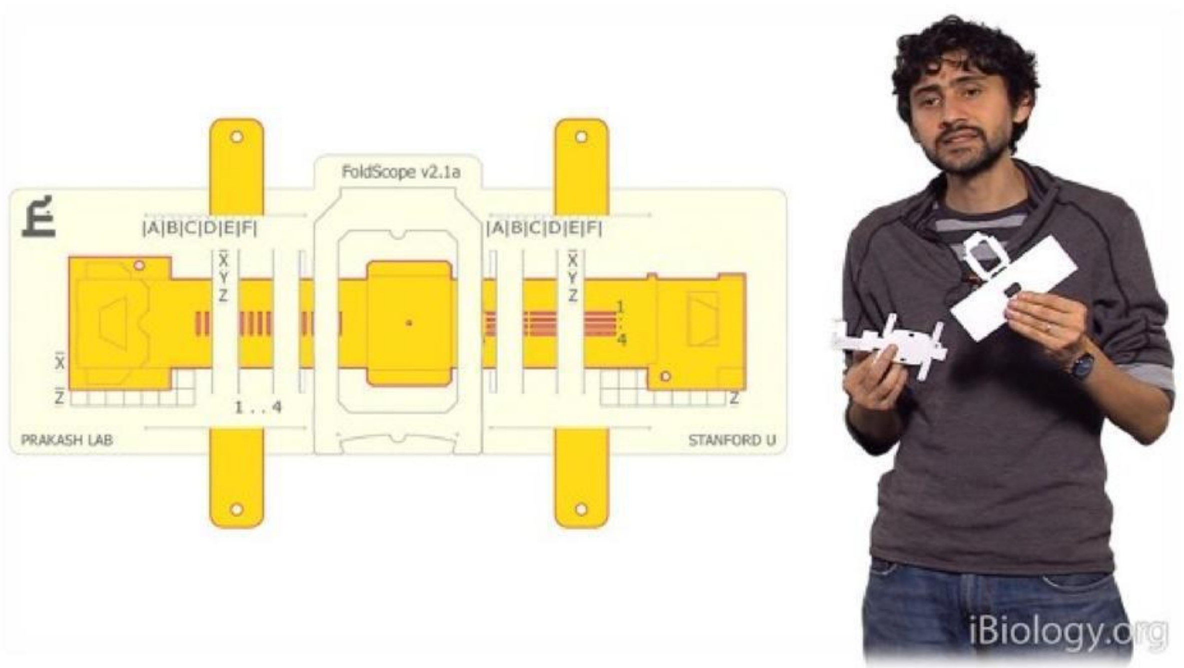

জলের দামে মাইক্রোস্কোপ

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ও

অনির্বাণ ঘোষ

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানু প্রকাশের (উপরের ছবি) ল্যাবরেটরী তৈরী করেছে এক অভিনব মাইক্রোস্কোপ, যা বানাতে খরচ হয় মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকা (এক ডলার)। এর নাম ফোল্ডস্কোপ, কোন বস্তুকে প্রায় ২০০০ গুণ পর্যন্ত বড় করে দেখাতে পারে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা শোনাচ্ছে অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও অনির্বাণ ঘোষ।

একটা লম্বা টেস্টের ফর্দ লিখে দিলেন ডাক্তারবাবু। সব টেস্ট এ চত্বরে হয়না, শহরে যেতে হবে। এই নিয়ে তিনবার ভিজিট হয়ে গেল ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। প্রথম দুবার শুধু ওষুধ দিয়েছিলেন। তাতে কাজ হলো না দেখে টেস্টের ফিরিস্তি। মাঝে খোকা একটু ভালো ছিল বলে ইস্কুলে পাঠানো হলো, কিন্তু হাফ-টাইমে আবার পড়লো জ্বরে। ইস্কুল থেকে কড়া ফোন এলো: ওকে পাঠাবেন না, প্লিজ। ও আসার পর আরো তিন-চারজনের জ্বর হয়েছে। টেস্টগুলোর মধ্যে একটা ছিল ম্যালেরিয়ার। ম্যালেরিয়া হয়নি তো?

খোকাকে নিয়ে খোকার মা গেল শহরে। সেখানে তার রক্তের স্যাম্পেল নেওয়া হবে। সেই রক্ত স্লাইডে বুলিয়ে তাকে রিএজেন্ট দিয়ে রঙ করা হবে। তারপর মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলে দেখা হবে তাতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু কিলবিল করছে কিনা। এটা করতে এত ঝক্কি কেন? ডাক্তারবাবু

টেস্টের ফর্দ চাপানোর আগে কিছু ঢিল ছুঁড়ে দেখলেন কেন? উনি নিজেই ম্যালেরিয়া কিনা, টুক করে ধরতে পারতেন না কি?

উপসর্গ দেখে আন্দাজ করতে পারতেন, কিন্তু যাদের দেখলে শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত হওয়া যায়, সেই জীবাণুরা তার নাগালের বাইরে। আমরা খালি চোখে যা দেখতে পাই, তারা তার চেয়ে প্রায় কয়েকশো গুন ছোটো। আর ছোটোকে খালি চোখের আওতায় আনতে দরকার মাইক্রোস্কোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র, যা আমাদের অদেখা জগতকে নিয়ে আসে দেখার মাঝে। কিন্তু মাইক্রোস্কোপের গঠন বেশ জটিল আর এর সঠিক কার্যকারিতার জন্য দরকার আলোর পথের উপর সুক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ। এগুলো কিন্তু মোটেই সস্তায় আসে না।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানু প্রকাশের ল্যাবে এই সমস্যাটার সমাধান খোঁজার চেষ্টা চলছিলো। 'সস্তায় বিজ্ঞান' বা 'ফ্রুগাল সাইন্স' এই ল্যাবের একটা মন্ত্র। তাই তাঁরা তৈরী করতে পেরেছেন এক অভিনব মাইক্রোস্কোপ, যা বানাতে খরচ হয় ডাক্তারবাবুর ভিজিটের থেকেও কম – মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকা (এক ডলার)। এত সস্তা হওয়ার কারণ আর কিছুই না – মূল একটা আলোর উৎস আর লেন্সটা ছাড়া বাকি মাইক্রোস্কোপটা কাগজের তৈরী! আর ছোট সাইজের লেন্সও সম্প্রতি সস্তায় বানানো সম্ভব হয়েছে – সেলফোনে ক্যামেরার বাহার তো দেখছেনই!

কিন্তু কাগজের তৈরী কেমন করে হলো? কাগজ ভাঁজ করে এটাসেটা তো আমরা কতই বানিয়েছি – হাঁস কি নৌকা বানিয়ে জলে ভাসিয়েছি, গোলাপ বানিয়ে সারপ্রাইজ দিয়েছি। এখানেও সেই একই নীতি – অরিগ্যামি।

কাগজ ভাঁজ করে তাঁরা এমন এক মাইক্রোস্কোপ তৈরী করেছেন যাতে স্লাইডে পড়া আলো লেন্স দিয়ে আমাদের চোখে আসবে এবং সেই আলোর পথের উপর আমাদের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

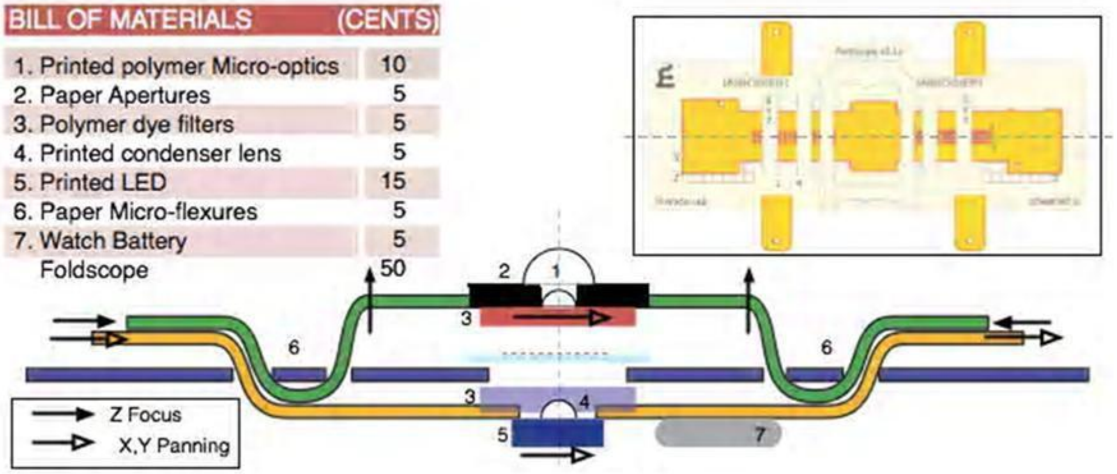

লেন্সটা যে স্ট্রাকচারে আটকে আছে, তাকে দুটো বুড়ো আঙ্গুল চেপে বা ছেড়ে দিয়ে লেন্সটাকে আগুপিছু করে ফোকাস করতে হবে। স্লাইডটাকে না সরিয়ে, আঙ্গুলের সাহায্যে লেন্স আর আলোর উৎসটাকে একসাথে সরিয়ে 'প্যানিং'-ও করা যাবে । (ছবির উৎস: http://www.foldscope.com/#/foldscope/)

ব্যবহার করার সময় মাইক্রোস্কোপটা আমরা চোখের সামনে ধরবো – ঠিক যেমন সূর্যগ্রহণের সময় চোখের সামনে ফিল্টার ওয়ালা কাগজ ধরা হয়। লেন্সটা যে স্ট্রাকচারে আটকে আছে, তাকে দুটো বুড়ো আঙ্গুল চেপে বা ছেড়ে দিয়ে লেন্সটাকে আগুপিছু করে ফোকাস করতে হবে। সাধারণ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ ফোকাস করছি যখন, লেন্সের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বাড়াচ্ছি বা কমাচ্ছি। এখানে একখানি লেন্স, তার সাপোর্টিং স্ট্রাকচারের বক্রতা বাড়িয়ে কমিয়ে ফোকাস করবো আমরা।

আরেকটা জিনিস: লম্বা স্লাইডকে খুদে বলমার্কা লেন্স পুরোটা একসাথে ধরতে পারেনা। কিন্তু আমরা আঙ্গুলের সাহায্যে লেন্স আর আলোর উৎসটাকে একসাথে সরাতে পারি, স্লাইডটাকে না সরিয়ে, যাকে বলে প্যানিং। ব্যাস, এই কাগজের মাইক্রোস্কোপ নিয়ে আমরা যত ইচ্ছে প্যান আর ফোকাস করতে পারি – আর জগতের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর খুঁটিনাটি আমাদের নখদর্পণে! আমাদের ফোনের ক্যামেরা দিয়ে পছন্দমত জিনিসের ছবি তুলে বন্ধুদের ক্যুইজ-ও করা যেতে পারে! শুধু তাই নয়, ঘর অন্ধকার করে তার দেওয়ালে সোজাসুজি মাইক্রোস্কোপের ছবি প্রোজেক্ট করা যেতে পারে। সত্যজিত রায়ের 'গণশত্রু' ছবি মনে আছে? ডাঃ গুপ্তর (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) কাছে ফোল্ডস্কোপ থাকলে তিনি মন্দিরের জলের ভিতরে জীবানুরা যে কিলবিল করছে, তা একঘর ভর্তি মানুষের সামনে সিনেমার মত সরাসরি দেখাতে পারতেন।

তবে এই আপাত সহজ ধারনা থেকে একটা সত্যিকার ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র বানাতে প্রযুক্তিবিদদের অনেক চিন্তা করতে হয়েছে। যেমন ধরা যাক, কিভাবে কাগজ ভাঁজ করে করে এই মাইক্রোস্কোপের স্ট্রাকচারটা তৈরী করা হবে। কম্পিউটার সফটওয়্যারে তার জ্যামিতিক ছবি বা প্ল্যান না হয় বানানো গেলো। কিন্তু আসল কাগজ তো আর নির্ভেজাল জ্যামিতিক সমতল নয়, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছাড়াও তার একটা ছোট্ট বেধ আছে। তার জন্য কাগজের ভাঁজগুলো প্ল্যানের জ্যামিতিক সরলরেখার থেকে একটু এদিক-ওদিক হয়ে যেতেই পারে। সেটা হলে লেন্স আর আলোর উৎসের এলাইনমেন্ট বা বিন্যাস বিগড়ে যেতে পারে! হিসেব করে দেখা যায় যে কাগজের বেধ যদি h হয় তাহলে এই এলাইনমেন্টের গড়বড়ের পরিমাণ-ও মোটামুটি h হওয়ার কথা। ওইটুকু গন্ডগোলই এই খুদে মাইক্রোস্কোপের কাজে ব্যাগড়া দিতে পারে। তাহলে উপায়?

এই ধরনের সমস্যার মোকাবিলা ইঞ্জিনিয়াররা আগে করেছেন সূক্ষ্ম মেশিন ডিজাইন করতে গিয়ে। এর উপায় বার করতে মানু প্রকাশ আর তাঁর দলবল সেই মেশিন ডিজাইনের গাণিতিক তত্ত্ব অনুযায়ী ফোল্ডস্কোপের প্ল্যানে এমন কিছু ভাঁজের কম্বিনেশন ঢোকালেন যা ওই এলাইনমেন্ট এর গড়বড়ে বাধা দেয়। এইসব ইঞ্জিনিয়ারিং মারপ্যাঁচ সত্যি সত্যি কাজ করছে কিনা দেখতে একটা পরীক্ষা করা হলো। তাঁরা 350 মাইক্রোমিটার পুরু কাগজের কুড়িটা ফোল্ডস্কোপ বানিয়ে প্রতিটাকে কুড়িবার খুললেন আর ভাঁজ করলেন। দেখা গেল প্রতিবার এলাইনমেন্ট হচ্ছে নিঁখুত ভাবে - গরবড়ের পরিমান কাগজের বেধের থেকে অনেক কম।

এরকম নানা ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি লাগিয়ে শেষমেষ যেটা দাঁড়ালো সেটা মোটের ওপর মন্দ কাজ করে না। এই ফোল্ডস্কোপে সহজেই এক মাইক্রোমিটার পর্যন্ত দূরত্বের দুটো বিন্দুকে আলাদা করে চেনা যায়। এছাড়া ফোল্ডস্কোপের আরেকটা বিশেষত্ব হলো এর মূল ডিজাইনে একটু অদল বদল করে একে নানারকম বিশেষ বিশেষ কাজের উপযোগী করে তোলা যায়। আর বেশ কম খরচেই। এর

ডিজাইনটাও এতই সরল যে আধুনিক নির্মাণ-প্রযুক্তিতে বছরে এক হাজার কোটি ফোল্ডস্কোপ বানানো সম্ভব। এবং গঠন এমনই মজবুত যে হাত থেকে ফেললে কি পায়ে চাপলে, আবার কুড়িয়ে নিয়ে তাকে আগের মতই ব্যবহার করা যায়। ঠুঁটো জগন্নাথের মত তাকে ল্যাবের এক কোনায় বসিয়ে রাখার দরকার নেই।

মানু প্রকাশের স্বপ্ন প্রত্যেক শিশুর পকেটে থাকবে একটা করে ফোল্ডস্কোপ।
(ছবির উৎস: http://www.foldscope.com/#/foldscope/)

মানু প্রকাশের সেটাই স্বপ্ন। প্রত্যেক শিশুর পকেটে থাকবে একটা করে "ফোল্ডস্কোপ"। মনে যে প্রশ্নই জাগুক না কেন, ক্ষুদ্র জগত সম্পর্কিত বলে সেটা আর অধরা থাকবে না। মৌমাছির ডানার নক্সা কি ফুলের রেণু, সবেরই ক্লোসআপ পেয়ে যাবে তারা। মনে শুধু প্রশ্ন আসতে হবে। তাঁর কথায়, বিজ্ঞানকে শুধু ল্যাবরেটরির চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে হাতিয়ার দিতে হবে জানার সীমাকে লঙ্ঘন করার, তবেই বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরী করা যাবে।

বিজ্ঞানের এই গণতান্ত্রিকরণে উঠেপড়ে লেগেছেন মানু প্রকাশ। একটা প্রজেক্ট চালু করেছিলেন তিনি - বিনামূল্যে ফোল্ডস্কোপ বিতরণ করবেন। শর্ত একটাই, সেটা কিভাবে ব্যবহার করা হলো এবং কি প্রশ্নের সুলুকসন্ধান পাওয়া গেল, সেটা ওনাদের জানাতে হবে। প্রজেক্টটা চলেছিল এক বছর। এই প্রজেক্টের দরুণ তিনি ফোল্ডস্কোপের এমন ব্যবহার দেখেছেন, যা কল্পনাও করতে পারেননি।

আর চিকিৎসাশাস্ত্রে এর উপকারিতা অনস্বীকার্য। খোকার ডাক্তার তাঁর চেম্বারে বসে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে এই ফোল্ডস্কোপের তলায় দেখে চট করে বলে দিতে পারবেন ম্যালেরিয়া হয়েছে কিনা। রোগ নিয়ে ইস্কুলেও যেতে হবে না, সঠিক চিকিৎসা হবে প্রথম দিন থেকেই। আর বিশেষ সংক্রামক কোনও রোগ হলে পরীক্ষার পর স্লাইডসুদ্ধু গোটা মাইক্রোস্কোপটাকেই পুড়িয়ে ফেলা যাবে।

এখনো বাজারে ছাড়ার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

আমাদের বানানো একটি ফোল্ডস্কোপ

চলছে। ভারতে ফোল্ডস্কোপ আনার চেষ্টা করছে ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজি। তাদের স্টার কলেজ স্কিমের দরুণ যেসব কলেজকে তারা চিহ্নিত করেছে, সেখানে তারা ফোল্ডস্কোপ আনার চেষ্টা করছে। 'বিজ্ঞান'-এর পক্ষ থেকে মানু প্রকাশের সাথে যোগাযোগ করা হলে উনি সানন্দে আমাদের ফোল্ডস্কোপের কয়েকটি নমুনা পাঠিয়ে দেন। ফোল্ডস্কোপ হাতে পেয়েই আমরা পেঁয়াজের খোসা, টমেটোর ছাল, বিড়ালের লোম, কিচেন সিঙ্কের জল, পানীয় জল, শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ, ও আরো অনেক কিছু কেমন হয় দেখে ফেললাম। তার কয়েকটি ছবি আপনাদের জন্য রইল পরে।

আমাদের তোলা ফোল্ডস্কোপ দিয়ে পেয়াজের ছবি। দেখা যাচ্ছে কোষ প্রাচীর এবং কিছু অন্যান্য cell-organelle।

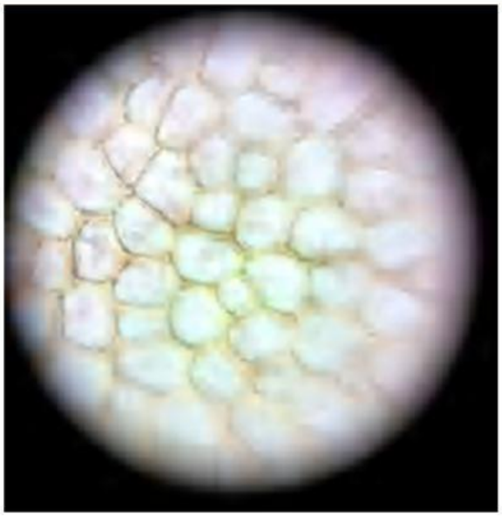

টমেটোর খোসা। কোষের মধ্যে লাল রঞ্জক পদার্থ দেখা যাচ্ছে - এর জন্য টমেটো লাল হয়।

বিড়ালের লোম

তবে একটা ব্যাপারে সন্দেহ নেই। এটা যদি বাজারে আসে, চিকিৎসা এবং শিক্ষা জগতে একটা গুরুতর পরিবর্তন হতে চলেছে।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2015/12/14/foldscope/

(লেখাটি ১৪-ই ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)

প্রচ্ছদের ছবির উৎস: http://www.ibiology.org/

লঙ্কাকাণ্ড

পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেবী

"আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়িমাছের ঝালচচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা)

লঙ্কা ছাড়া আবার আমাদের রান্না হয় নাকি? কিন্তু রান্নায় লঙ্কা বেশি পড়লে হু-হা করতে থাকি। আবার ক্যাপসিকামে যখন কামড় দিই তখন তো ঝাল লাগে না। দুটোই তো লঙ্কা! তার মানে সব লঙ্কা সমান ঝাল হয় না। এই

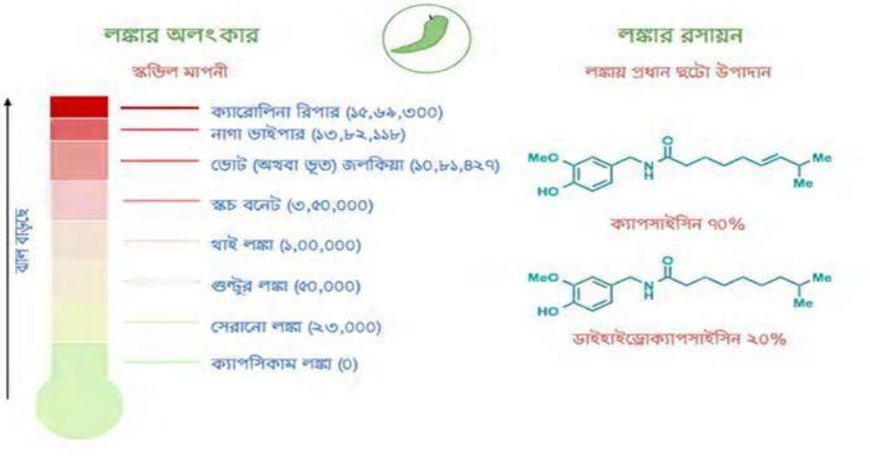

ব্যাপারটা আমাকে অনেকদিন ধরে ভাবাচ্ছে। তাই জগন্নাথদার কাছে চলে গেলাম। জগন্নাথদা হলো অনেকটা ফেলুদার সেই সিধুজ্যাঠার মত। সবই জানে প্রায়। "প্রায়" বললাম কারণ আর যাই জানুক রান্না করতে একেবারেই জানে না। তবে রান্নার রসায়ন বিলক্ষণ জানে।

জগন্নাথদা প্রথমেই একটা কাগজে সুন্দর থার্মোমিটারের মত বস্তু এঁকে ফেলল (উপরের

ছবি)। "বুঝলি তো, একে বলে স্কভিল স্কেল (মাপনী)।" জগন্নাথদার গলায় তখন আমাকে জ্ঞান দেওয়ার সুর।

"সেটা আবার কি?" যথারীতি আমার অজ্ঞানতার প্রকাশ।

জগন্নাথদার মুখ চলতে থাকে। "উইলবার স্কভিল বলে এক মার্কিন বিজ্ঞানী ১৯১২ সালে এক পরীক্ষা করেন যার মাধ্যমে লঙ্কার ঝাল মাপা যায়। সেটাই এখন স্কভিল স্কেল (Scoville scale) বলে পরিচিত।"

এরপর জগন্নাথদার কথা চলতে থাকলো আর মাঝে মাঝে আমার "হুম, আচ্ছা"। তবে মোটামুটি যা বুঝলাম তা হলো লঙ্কায় ক্যাপসাইসিন (capsaicin) কতটা আছে তার ওপর নির্ভর করে কোন লঙ্কা কত ঝাল হবে। আর সেটার ওপর নির্ভর করেই তৈরি হয়েছে এই স্কভিল মাপনী। ক্যাপসাইসিন ও তার বিজারিত (বিজারিত কারণ দুটো হাইড্রোজেন বেশি আছে, ইংরাজিতে বলে reduced) ভাই ডাইহাইড্রোক্যাপসাইসিন (dihydrocapsaicin) হলো লঙ্কার যৌগপদার্থগুলোর মধ্যে প্রধান উপাদান (ওপরের ছবি দেখো)। ওপরের ছবিতে স্কভিল মাপনীতে কয়েকটা লঙ্কার নাম দেওয়া হলো যেগুলো প্রচণ্ড ঝাল বলে কুখ্যাত। ক্যারোলিনা রিপার এখনো পর্যন্ত (জুলাই, ২০১৪) সবচেয়ে বেশি ঝাল লঙ্কা বলে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছে। কাছাকাছি থাকবে নাগা ভাইপার। ক্যারোলিনা রিপার ও নাগা ভাইপার দুটিই সংকর প্রজাতির। নাগা ভাইপার ইংল্যান্ডে তৈরি হলেও আসলে ভারতেরই নাগা মরিচ, ভোট জলকিয়া, ইত্যাদি নানারকম লঙ্কার সংকর প্রজাতি। ভোট জলকিয়া নিজেও কম যায় না। আদতে ভুটানের হলেও ভারতের অসম ও অন্যান্য উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলোতে ভোট জলকিয়া পাওয়া যায়। এছাড়া অন্ধ্রের গুন্টুর থেকে গুন্টুর লঙ্কাও আছে এই মাপনীর বেশ ওপরের দিকেই।

এর পরেই জগন্নাথদা একটা মোক্ষম প্রশ্ন করে বসল, "বলত, ঝাল লেগে জিভ জ্বলতে শুরু করলে জল খেলেও খুব একটা লাভ হয়না কেন?"

আসলে এটা আমারও প্রশ্ন। কাজেই জগন্নাথদাকে বললাম, " তুমিই বল।"

"লঙ্কার মধ্যে থাকা ভিলেনের সঙ্গে তোকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। একটু লক্ষ্য করে দেখ যে ক্যাপসাইসিনের রাসায়নিক গঠন কোন দিকে ইঙ্গিত করছে।" বুঝলাম জগন্নাথদা আমার পেট থেকে উত্তরটা বের করে আনতে চান। এখন ব্যাঙ্কে চাকরি করি বটে, কিন্তু কলেজে রসায়ন পড়ার ফলে আন্দাজ করে ধরে ফেললাম ব্যাপারটা।

"জলের সঙ্গে তো তিনি মিশতেই চান না। ক্যাপসাইসিনে নাইট্রোজেন, অক্সিজেনের মত ইলেক্ট্রোনেগেটিভ পরমাণুর অনুপাত কার্বন আর হাইড্রোজেনের থেকে অনেকটাই কম হওয়ায় জলের পক্ষে তাকে ধুয়ে সাফ করা সম্ভব নয়।" মনে হলো যেন মুখ থেকে দৈববাণী হচ্ছে। বেশ তৃপ্ত হলাম।

এর পরেই আমার মস্তিষ্কের বাতি জ্বলে উঠলো, বললাম, "তাহলে জগন্নাথদা, রান্নার তেল খেলে তো কাজ হবার কথা, তাই তো? তেল তো বলতে গেলে শুধুই কার্বন আর হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি।"

"তোর চিন্তাভাবনা ঠিক দিকেই এগোচ্ছে বটে কিন্তু আমরা তো আর ঢক ঢক করে তেল খেতে পারব না, তাই দুধ খেয়ে সমস্যার সমাধান করা যেতেই পারে। কার্যত, অনেক বাড়িতেই মা-মাসিরা কিন্তু এই টোটকা অনেক প্রজন্ম ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন। দুধের মধ্যে থাকে কেসিন (casein) বলে এক প্রকার প্রোটিন (protein) যা জলের সঙ্গে মেশে না তাই ক্যাপসাইসিনকে ধুয়ে সাফ করতে এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে? এক কাপ ঠান্ডা দুধ খেয়ে নিলে ঝাল লাগার কষ্টটা অনেকটাই চলে যাবে।"

জগন্নাথদার পরামর্শ লিখে নিলাম নোট খাতাতে। তোমরাও লিখে রেখো কিন্তু, ঝাল লাগলে কাজে দেবে।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2014/07/19/lankakando

(লেখাটি ১৯-ই জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

পদক্ষেপ (http://padakshep.org/) একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা পশ্চিমবঙ্গের দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করে।

প্রচ্ছদের ছবি : উইকিপিডিয়া।

পেখম রহস্য

অনিন্দিতা ভদ্র

আই. আই. এস. ই. আর., কলকাতা

বর্ষার গান মানেই মেঘের গুরু গুরু, অন্ধকার আকাশ, ভিজে মাটির গন্ধ, আর ময়ূরের অপরূপ পেখম নৃত্য। আমাদের জাতীয় পাখির সাজসজ্জায় মুগ্ধ হয় না এমন মানুষের সংখ্যা বিরল।

ছোটবেলায় আর সব বাচ্চাদের মতো আমিও ভাবতাম বুঝি সব ময়ূরই সুন্দর, সবার পেখম আছে, সবাই নাচে। কিন্তু যখন প্রথমবার চিড়িয়াখানায় ময়ূর-ময়ূরী দেখলাম, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি যে দুটোই আসলে একই পাখি । আরো অবাক হয়েছিলাম এটা শুনে যে সুন্দর লেজওয়ালা পাখিগুলো ছেলে (পুরুষ) পাখি, আর খারাপ দেখতে পাখিগুলো মেয়ে!

আরো বড়ো হলাম যখন, জানলাম যে অধিকাংশ পাখিদের মধ্যে পুরুষ পাখিরাই বেশী সুন্দর। যে সব পাখি গান গায়, তাদের মধ্যেও পুরুষরাই সুরেলা। একটু চোখ মেলে চারিদিকে তাকালেই দেখা যাবে, পশুপাখীদের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রজাতিতেই পুরুষরাই বেশী আকর্ষণীয়। ঝিঁঝিঁর ডাক থেকে শুরু করে কোকিলের গান, ময়ূরের পেখম থেকে হরিণের লম্বা, বাঁকানো শিং, সবই পুরুষজাতির অলংকার। এই সব প্রজাতিতে মহিলাদের সাজগোজের প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন এমন হয়?

> পশুপাখীদের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রজাতিতেই পুরুষরাই বেশী আকর্ষণীয়। প্রশ্ন হল, কেন এমন হয় ?

১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন যখন তাঁর বিবর্তন তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর ঐতিহাসিক রচনা,

'দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস'-এ তিনি লিখেছিলেন যে তাঁর তত্ত্ব খাটে না শুধু দুটি ক্ষেত্রে।

এক হলো মৌমাছি, পিঁপড়ে, বোলতা এই জাতীয় প্রাণী। এদের নিয়ে তিনি বিব্রত, কারণ জগতের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি প্রাণী প্রজনন করে তার নিজের বংশ বৃদ্ধি করে, কিন্তু মৌমাছিরা তা করে না। হাজার হাজার মৌমাছি মিলে শুধু একজন রাণীর জন্য বেগার খাটে কোনো অজানা কারণে। কেন মৌমাছি, পিঁপড়ে, বোলতা বা উইপোকাদের এরকম অদ্ভুত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছিলেন উইলিয়াম হ্যামিল্টন, ১৯৬৪-এ। কিন্তু এখন বলব অন্য গল্প, ডারউইন সাহেব যা শুরু করেছিলেন দেড়'শ বছর আগে। সেই গল্পের নায়ক হলো আমাদের জাতীয় পাখি, ময়ূর।

ডারউইন সাহেব তাঁর জাহাজ এইচ. এম. এস. বিগলের সফরে অনেক রঙবেরঙের পাখি দেখেছিলেন। পুরুষ পাখিদের সাজ, যা অনেক সময় একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশী হয়ে ওঠে, ডারউইনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। রঙবেরঙের পালক দেখতে অপূর্ব তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই রঙ তৈরী করতে খরচা আছে, আর তার রসদ আসে পাখির নিজের শরীর থেকেই। শুধু তো রঙ নয়, ময়ূরের পেখম অস্বাভাবিকরকম লম্বাও। আর তাই উড়তে পারে না ময়ূর, নেকড়ের তাড়া খেলে নিজেকে বাঁচাতেও পারে না। অথচ ময়ূরীকে দেখ, কোনো সাজ নেই, বাহার নেই, মাপেও ছোটখাটো। দিব্যি তো বেঁচে বর্তে রয়েছে তারাও।

এই ধরণের উদাহরণ অসংখ্য, বিশেষ করে পাখিদের মধ্যে। ডারউইন সাহেব এদের জন্য তৈরী করেছিলেন আরো একটি তত্ত্ব – থিওরি অফ সেক্সুয়াল সিলেকশন। তিনি বলেছিলেন, এই

ময়ূরের পেখম অস্বাভাবিকরকম লম্বা। আপাতদৃষ্টিতে শরীরের যে গঠনকে দেখে আমাদের মনে হয় প্রতিবন্ধকতা, তা আসলে ময়ূরের স্বাস্থ্য আর ক্ষমতার পরিচয়।

পাখিদের সাজ শুধুই প্রমিলাদের মুগ্ধ করতে, অর্থাৎ এর মূলেও রয়েছে সেই বংশ বিস্তারের প্রাকৃতিক তাড়না। শুধু তো নিজে সাজলেই চলবে না, দেখতে হবে যাতে সেই সাজ অন্য সবার সাজকে ছাপিয়ে যায়। তাই আরো, আরো উজ্জ্বল রঙ চাই, আরো লম্বা লেজ চাই, বা আরো সুরেলা, কঠিন গান চাই। এইভাবেই, নিজেদের মধ্যে সবসময় প্রতিযোগিতা চালিয়ে যায় পুরুষরা, আর সবথেকে সুন্দর পুরুষদের ভাগ্যে জোটে সবচেয়ে ভালো সঙ্গিনী – ভালো সঙ্গিনী মানে, যার প্রজনন ক্ষমতা বেশী। সুতরাং যে পুরুষ যত বেশী সুন্দর, তার বংশ বৃদ্ধিও হয় তত বেশী। অতএব, আবার সেই ন্যাচারাল

সিলেকশন-এর খেলায় ময়ূরের পেখমের বাহার ছড়ায়। এই যুক্তির রেশ টেনে ডারউইন সাহেব বলেছিলেন, যে সব প্রজাতির স্ত্রীরা তাদের পুরুষ সঙ্গী নির্বাচন করবে, সেই সমস্ত প্রজাতির পুরুষদের মধ্যেই দেখা যাবে মনোহরণের আড়ম্বর।

পেখমের মধ্যে শুধু ময়ূরীরা রঙের বাহারই খোঁজে না, তার সাথে খোঁজে সমতা।

ডারউইনের এই দ্বিতীয় তত্ত্বটিকে অনেকেই উপেক্ষা করেছেন। কেউ কেউ খোলাখুলি এর বিরুদ্ধে যুক্তিও দিয়েছেন। ডারউইনের সেক্সুয়াল সিলেকশন তত্ত্বের সাথে ১৯৭৫ সাল থেকে জুড়ে গেছে আরো এক তর্কের সূত্র – জাহাভির হ্যান্ডিক্যাপ প্রিন্সিপল (প্রতিবন্ধকতা নীতি)। আমোৎস্ জাহাভি (Amotz Zahavi) একজন ইজরায়েলী বৈজ্ঞানিক। ময়ূরের পেখমকে ঘিরে যে প্রবল মতবিরোধ চলে আসছিল বহু বছর ধরে, জাহাভি তাতে যোগ করেন আর একটি দিক। তিনি বলেন যে ময়ূরের পেখম নেকড়ের হাত থেকে বাঁচার পথে প্রতিকূল বলে তা প্রতিবন্ধকতা ঠিকই, কিন্তু যে পাখি সেই প্রতিবন্ধকতা নিয়েও বেঁচে থাকতে সক্ষম, সে অবশ্যই ময়ূরীদের কাছে সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য। সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে শরীরের যে গঠনকে দেখে আমাদের মনে হয় প্রতিবন্ধকতা, তা আসলে ময়ূরের অনেস্ট সিগনাল, যা তার স্বাস্থ্য আর ক্ষমতার পরিচয়। ময়ূরের পেখমের বাহার স্বয়ম্বরা ময়ূরীদের কাছে পাত্র হিসেবে তার যোগ্যতার অকপট সংকেত পৌঁছে দেয়। সুতরাং, এই প্রতিবন্ধকতাকে ন্যাচারাল সিলেকশন জিইয়ে রাখে, আরো মেজে ঘসে সুডৌল করে তোলে। জাহাভির প্রতিবন্ধকতা নীতি বৈজ্ঞানিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বলাই বাহুল্য যে এরকম একটা সুন্দর গোল গল্প অনেকেই মেনে নিতে রাজী হননি। কিন্তু পশুজগতে এই নীতি আদৌ সত্যি কিনা, তা কেউ যাচাই করে দেখেননি দুই দশক ধরে।

১৯৭৫-এ যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল জাহাভির জার্নাল অফ থিওরেটিকাল বায়োলজিতে ছাপানো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দিয়ে, ১৯৯১ সালে এনিম্যাল বিহেভিয়ার-কে পাঠানো মারিয়ন পেট্রির একটি কাজ তার মিমাংসার পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বৈজ্ঞানিক মহলে প্রকাশ পেল। লন্ডনে বসে একদল ময়ূর-ময়ূরীর ওপর গবেষণা চালাচ্ছিলেন পেট্রি ও তাঁর সহকর্মীরা। ১৯৯১ থেকে শুরু করে ১৯৯৬ পর্যন্ত পর পর কয়েকটি পেপার ছাপা হয় এই গবেষক দলটির। তাঁরা প্রমাণ করেন যে সবচেয়ে লম্বা আর বাহারে পেখম যে ময়ূরদের, তাদেরকেই পছন্দ করে ময়ূরীরা। আরো জানা যায় যে পেখমের মধ্যে শুধু ময়ূরীরা রঙের বাহারই খোঁজে না, তার সাথে খোঁজে সমতা বা সিমেট্রি। অতএব, পেখম মেলে ধরে যখন ময়ূর নাচে, তখন ময়ূরী দেখে নেয় পেখমের মধ্যে চোখগুলো কিভাবে ছড়ানো রয়েছে বা দুপাশের চোখের সারিগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা। এখানেই শেষ নয়, পেট্রি-রা আরো দেখালেন যে সব ময়ূর পেখমের সাজে ময়ূরীদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়, তাদের পেখম ছেঁটে দিলে বা তাতে নতুন পালক জুড়ে তার সমতা কমিয়ে দিলে সেই একই ময়ূর আর প্রমিলা মহলে পাত্তা পায় না বিশেষ। এমনকি এও জানা গেল যে বেশী লম্বা পেখম যাদের, সেই ময়ূরদের প্রজনন ক্ষমতাও বেশী। শুধু তাই নয়, লম্বা পেখমওয়ালা ময়ূরদের সন্তানরা জন্মের সময় থেকেই মাপে কিছুটা বড় হয়, আর তাদের জীবনী শক্তিও হয় বেশী। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হল যে, ইংল্যান্ডের হুইপস্নেড পার্কে রাখা দলটির ওপরে একবার নেকড়েদের হামলা হয়, আর তাতে যে ময়ূররা মারা পড়ে,

তাদের পেখম বাকিদের তুলনায় কম বাহারী ছিলো। পেট্রিদের কাজ থেকে প্রথমবার প্রমাণ হল যে ময়ূরীরা পেখমের বাহার দেখেই সঙ্গী নির্বাচন করে এবং সেই নির্বাচিত ময়ূররা বাকিদের তুলনায় বেশী সুস্থ ও প্রজননে বেশী সক্ষম।

ডারউইনের সেক্সুয়াল সিলেকশন-এর তত্ত্ব তৈরী হয়েছিল তাঁর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। তিনি বলেছিলেন যে সব প্রজাতির মধ্যে প্রজনন নির্ভর করে নারীদের নির্বাচন স্বাধীনতার ওপর, সেই সব প্রজাতিতে বাহারী পুরুষ দেখতে পাওয়া যুক্তিযুক্ত। কেন বেঁচে থাকার পথে যা প্রতিবন্ধক, এমন গঠনকেও টিকিয়ে রাখে ন্যাচারাল সিলেকশন, তার সপক্ষে জাহাভি দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁর হ্যান্ডিক্যাপ প্রিন্সিপল-কে। কিন্তু এসবই তত্ত্ব, আর যে কোনো তত্ত্বই প্রমাণ সাপেক্ষ। সেই প্রমাণ এসেছে পেট্রিদের কাজের মাধ্যমে। পেট্রি অবশ্য এখানেই ময়ূর নিয়ে গবেষণা থামিয়ে দেন নি। আরো নানারকম পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন জীবজগতের নানান রহস্য উদঘাটনের প্রচেষ্টায়।

আমার কথাটি ফুরিয়েও ফুরোয়নি এখনও। একটা দুঃখের কথা এখানে না বলে পারছি না। আমাদের জাতীয় পাখিটি বহু বছর ধরেই বৈজ্ঞানিক বিতর্কের বিষয় ছিল। গত তিন দশকে ময়ূর হ্যান্ডিক্যাপ প্রিন্সিপল-এর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়ে কোনো বই এমন হয় না যাতে ময়ূরের ছবি নেই। কিন্তু ময়ূরকে নিয়ে গবেষণা তো দূরের কথা, আমাদের দেশের কোনো বৈজ্ঞানিক কোনদিন ভাবেন নি যে এই পাখিটিকে দিয়ে খুব সহজেই হ্যান্ডিক্যাপ প্রিন্সিপলকে যাচাই করা যায়। সেই কাজ হল অবশেষে ইংল্যান্ডে, ভারতীয় ময়ূরকে নিয়েই। ময়ূর নিয়ে বিতর্কের শেষ হয়নি মারিয়ন পেট্রি-র কাজ দিয়ে, বরং তৈরী হয়েছে আরো নতুন গবেষণার সুযোগ। ২০০৮-এ এনিম্যাল বিহেভিয়ার জার্নালে জাপানের এক বৈজ্ঞানিক দলের কাজ প্রকাশ হয়, যাতে তাঁরা জানান যে জাপানে রাখা ভারতীয় ময়ূরীরা মোটেও ইংল্যান্ড বাসিনীদের মতো নয়। বাহারী পেখম দিয়ে তাদের মুগ্ধ করা যায় না। বলাই বাহুল্য, এর উত্তর দিতে হয় পেট্রি-কে। তাঁর কাজে কি তাহলে কোনো ভুল ছিল? পেট্রি-র তরফ থেকে জবরদস্ত উত্তর পায় এনিম্যাল বিহেভিয়ার, তাকাহাশিদের কাজ প্রকাশিত হওয়ার চার মাসের মধ্যে, আর তার তিন মাস পরে প্রকাশিত হয় সেই জবাব। ময়ূরীরা ভুল করেনি, ভুল করেছেন তাকাহাশিরাই, গবেষণার পদ্ধতিতেই রয়েছে অনেক গলদ। ২০১১-তে দুই পক্ষের সওয়াল-জবাবকে কেন্দ্র করে আরো একটি কাজ প্রকাশিত হয় সেই এনিম্যাল বিহেভিয়ারে, এবারের গবেষণার কেন্দ্র কানাডার এন.আর.আই. ময়ূর-ময়ূরীরা। এই নিয়ে আরো বিতর্ক চলবে, কিন্তু ১৯৯১-এর পরে ভারতের জীববিজ্ঞান সমাজের হেঁট হয়ে যাওয়া মাথাটা আরো নীচুই হবে শুধু।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2015/09/14/peacock/

(লেখাটি ১৪-ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

ছবি: উইকিমিডিয়া

পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে

(শেষ অংশ)

রাজীবুল ইসলাম

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা এই গল্পের শুরুতে প্রশ্ন করেছিলাম: কোন পদার্থকে কত কম তাপমাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায়? তারপর বলেছিলাম এক অদ্ভুত কথা! বিশেষভাবে লেজার রশ্মির আলো ব্যবহার করে পরীক্ষাগারে কিছু গ্যাসকে ঠান্ডা করতে করতে একদম পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে (প্রায় -273 ডিগ্রী সেলসিয়াস) নিয়ে চলে যাওয়া যায়। তারপর...

তাপমাত্রা এবং পরমাণুর দ্রুতি

তাপমাত্রা যত কমে ততই অণু-পরমাণুর গতিশক্তি কমে। তারা ধীরে ধীরে স্থির হতে থাকে। একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যাক। বায়ুমন্ডলীয় চাপে সোডিয়াম গ্যাস 883 ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়। এই তাপমাত্রায় সোডিয়াম পরমাণুর গড় দ্রুতি (root mean square speed) সেকেন্ডে এক কিলোমিটারের কিছু বেশী। এই প্রবল গতি নিয়ে সোডিয়াম পরমাণুগুলো অনবরত অন্য পরমাণুদের সাথে ধাক্কা খেয়ে চলেছে। তুলনার জন্য বলা যাক, এরোপ্লেনের গতি সেকেন্ডে মাত্র 250 মিটার মত!

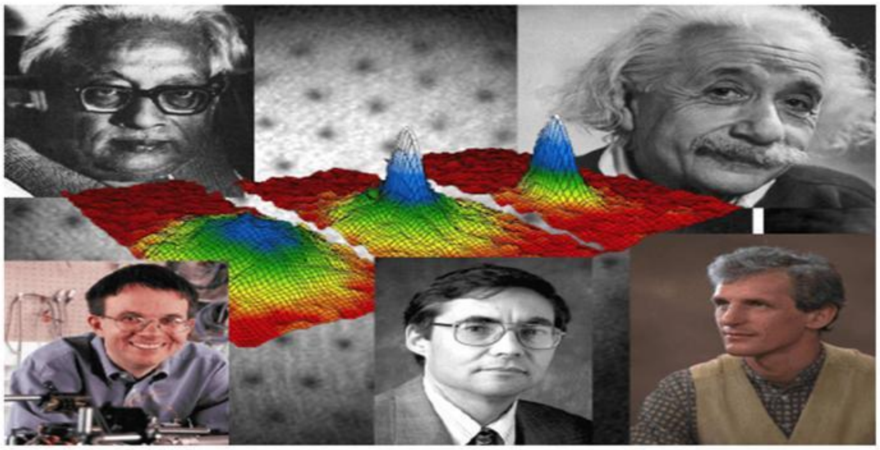

তাপমাত্রা কমাতে থাকলে এমনিতে সোডিয়াম পরমাণুগুলি কাছাকাছি এসে তরল আর তারপর কঠিনে পরিণত হবে। কিন্তু পরীক্ষাগারে প্রায় শূন্যস্থানের মধ্যে অনেক পরমাণুকে গ্যাসীয় অবস্থায় রাখা যায়। গ্যাসীয় পদার্থের পরমাণুর গড় দ্রুতি কেলভিন স্কেলের তাপমাত্রার বর্গমূলের ব্যাস্তানুপাতে কমতে থাকে। সেই হিসেব অনুযায়ী 'ঘরের তাপমাত্রায়' বা 300 K (কেলভিন)-এ গড় দ্রুতি কমে হবে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 570 মিটার। এবার লেজারের সাহায্যে তাপমাত্রা কমাতে কমাতে 1 মিলিকেলভিনের (= 0.001 K) কাছে এলে গড় দ্রুতি কমে হবে সেকেন্ডে 1 মিটার মত। আরো কমে মাইক্রোকেলভিনের (0.000 001 K) কাছে নিয়ে গেলে তা কমে হবে সেকেন্ডে মাত্র 3 সেন্টিমিটারের একটু বেশী!

লেজার কুলিং দিয়ে ঠান্ডা করার কোন সর্বনিম্ন সীমা আছে কি?

মনে প্রশ্ন আসতে পারে আলো দিয়ে ঠান্ডা করতে করতে কত কম তাপমাত্রায় যাওয়া যেতে পারে? সর্বনিম্ন কোন সীমা আছে কি? যে লেজার কুলিং-এর পদ্ধতি বিশদে ব্যাখ্যা করেছিলাম তা দিয়ে কয়েকশ' মাইক্রোকেলভিন পর্যন্ত নামা যায়। এর পরেও লেজারের আলো ব্যবহার করে আরো ঠান্ডা করা যায় – সেই প্রক্রিয়াটি তুলনামূলকভাবে একটু জটিল। কিন্তু আলো ব্যবহার করে যে একটা তাপমাত্রার নিচে নামা সম্ভব নয় তা সহজভাবে বুঝতে পারি কোন জটিল অঙ্ক না করেই, নিচের যুক্তি অনুযায়ী।

আগেই বলেছি আলোর কণিকা বা ফোটনের ভরবেগ আছে, এবং পরমাণুগুলো ঠান্ডা হওয়ার সময় নির্দিষ্ট রঙ বা কম্পাঙ্কের ফোটন শোষণ করতে এবং ছাড়তে থাকে। যেমন সোডিয়াম গ্যাসকে ঠান্ডা করতে লাগে 589 ন্যানোমিটার কম্পাঙ্কের আলো। কোন পরমাণু একটা ফোটন শোষণ করলে বা ছাড়লে নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী ধাক্কা খায়। ঠিক যেমন গোলকিপার বলের ধাক্কা খায় বা বন্দুক থেকে গুলি ছোড়ার ঠিক পরে সৈনিকের কাঁধ একটু পিছিয়ে আসে।

একটি সোডিয়াম পরমাণুর বেগ এই ধাক্কা খেয়ে সেকেন্ডে প্রায় 3 সেন্টিমিটার পালটে যায়। তাহলে তাপমাত্রা কমতে কমতে মাইক্রোকেলভিনের কাছে এসে পরমাণুর গড় গতিশক্তি এত কমে এসেছে যে আলোর একটা কণিকার ধাক্কাই তার গতিকে আমূল পালটে দিতে পারে! লেজার কুলিং-এ একটি পরমাণু বিক্ষিপ্তভাবে সবদিকে ফোটন ছাড়তে থাকে, তাই ফোটন ছেড়ে কখনো তার বেগ কমে যায়, আবার কখনো বেড়ে যায়। কিন্তু গড় দ্রুতি ফোটনের ধাক্কাজনিত বেগের মানের থেকে কম হতে পারে না।

ন্যানোকেলভিনের পথে

তাহলে, এই কি শেষ? মাইক্রোকেলভিনের নিচে আর কি ঠান্ডা করা যাবে না কোন গ্যাসীয় পদার্থকে?

তাও যায়। কী ভাবে? চায়ের পেয়ালা থেকে চা যেভাবে ঠান্ডা হয়, সেই ভাবে।

একটু খুলে বলি । গরম চায়ের পেয়ালা থেকে বাষ্প উড়তে দেখেছি সবাই। বাষ্প জলের গ্যাসীয় অবস্থা। চায়ের পেয়ালার মধ্যে যে জলের অণুগুলির গতিশক্তি সবথেকে বেশী তারা বাকি অণুদের আকর্ষণ কাটিয়ে বেরিয়ে আসে পেয়ালা থেকে, এটাই বাষ্পীভবন (evaporation) প্রক্রিয়া। সবথেকে বেশী গতিশক্তির অণুগুলো বেরিয়ে যাওয়ার দরুণ যারা পড়ে আছে তাদের গড় গতিশক্তি কমতে থাকছে! যেহেতু তাপমাত্রা হল এই গড় গতিশক্তির পরিমাপ, তাই আমরা দেখব যে চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আলোর সাহায্যে ঠান্ডা করা পরমাণুগুলোকে যখন আর আলো দিয়ে বেশী ঠান্ডা করা যাচ্ছে না তখন তাদের ফেলা হয় একটা পেয়ালার মধ্যে! কী এই পেয়ালা? চা'কে পেয়ালায় ঢালা হয় তাকে আটকে রাখার জন্য – চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে ঠিক একই ভাবে একটা পেয়ালা (বিজ্ঞানের ভাষায় ম্যাগনেটিক ট্র্যাপ) তৈরী করে পরমাণুদের আটকে রাখা যায়। এবার ধীরে ধীরে সেই ট্র্যাপ থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী পরমাণুদের বের করে দেওয়া হলে বাকি পরমাণুগুলো নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে ঠান্ডা হতে থাকবে। এই পদ্ধতিকে evaporative cooling বলা হয়! এভাবে তাপমাত্রা কমাতে

কমাতে প্রায় ন্যানোকেলভিনের (মাইক্রোকেলভিনের হাজার ভাগের একভাগ) কাছে নিয়ে চলে যাওয়া যায়।

এতক্ষণ আমরা পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে কী করে যাওয়া যায় তাই নিয়ে কিছু জানলাম। জানার জগতের বাইরে নতুনকে খোঁজা বিজ্ঞানের ধর্ম। তবে অনেক সময়ই নতুন জগতের সন্ধানে কিছু বিশেষ অনুপ্রেরণা থাকে। পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছের বিজ্ঞান যেমন রহস্যে ভরা, তেমনি তার থেকে ব্যবহারিক জীবনে লাভবান হওয়া যায় কিনা তা নিয়েও বিজ্ঞানীরা ভেবেছেন, এবং ভেবে চলছেন।

এক্ষেত্রে একটি অন্যতম অনুপ্রেরণা হল আরও নিঁখুত ঘড়ি আবিষ্কার করা। আপনারা অনেকে জি.পি.এস (GPS) নামক যন্ত্রটির সাথে পরিচিত হয়ত। এর সাহায্যে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান মাপা যায়। যা ব্যবহার করে উড়োজাহাজ মেঘের উপর দিয়ে সঠিক পথে উড়ে চলে বা সাবমেরিন নিঃশব্দে জলমগ্ন পাহাড়ে ধাক্কা না খেয়ে বিশ্বভ্রমণ করে। জি.পি.এস ব্যবহার করে চালকহীন গাড়ী তৈরীর চেষ্টা চলছে। এ সবের জন্য প্রয়োজন সময়ের সঠিক মাপ – আর তাই উন্নত ঘড়ি তৈরীর চেষ্টা। পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে পরমাণুর মধ্যে ইলেক্ট্রনগুলো একদম 'ঘড়ি মেপে' ওঠানামা করে ভিন্ন শক্তিস্তরে – সময়ের কোন হেরফের হয় না। এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরী ঘড়ি লক্ষ কোটি বছরে এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগও 'স্লো' হয় না! সময় গণনার মজার ইতিহাস আমরা অন্য কোন লেখায় আলোচনা করব। বর্তমান লেখাটি শেষ করব আরেক বিশেষ অনুপ্রেরণার কথা বলে। তা হল পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে পদার্থের নতুন অবস্থার খোঁজ।

পদার্থের নতুন অবস্থার সন্ধানে

প্রকৃতির এক অদ্ভুদ নিয়ম আছে। তাকে বলা হয় Uncertainty principle। ব্যাপারটা এরকম, কোন একটি কণা কোথায় আছে আর কত জোরে ছুটছে এদুটো একসাথে একদম সঠিক ভাবে জানা যায় না। আমাদের গল্পে, তাপমাত্রা কমতে কমতে সোডিয়াম পরমাণুদের গতিশক্তি এত কমে গিয়েছে যে তারা কোথায় আছে সেটা জানাই মুস্কিল হয়ে পড়েছে! এটা শুধু কোন যন্ত্রের অক্ষমতা নয় যে প্রযুক্তির উন্নতির সাথে কাটানো যাবে – এটা প্রকৃতির একটা নিয়ম। বিজ্ঞানী ফাইনম্যানের কথায় – "যদি এই নিয়ম ভালো না লাগে, তাহলে অন্য কোন জগতে চলে যাও!"

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে Uncertainty principle নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না, কারণ ইঁট-

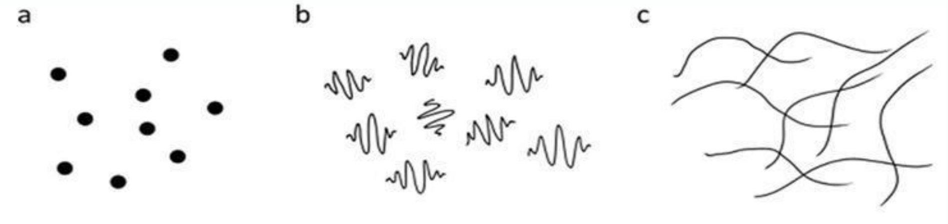

(**কণার তরঙ্গ ধর্ম** – তাপমাত্রা কমার সাথে কোন কণার অবস্থানের (যেমন অণু বা পরমাণু) নিশ্চয়তা কমতে থাকে। তখন কণা হিসাবে তাদের ভাবা যায় না– তরঙ্গ হিসাবে ভাবতে হয়। এই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে তাপমাত্রা কমার সাথে সাথে। খুব কম তাপমাত্রায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য এত বড় হয়ে যায় যে এক পরমাণুর তরঙ্গ অন্যর উপর এসে পড়ে – তখন জন্ম নেয় পদার্থের নতুন অবস্থা। এখানে তিনটি আলাদা তাপমাত্রায় গ্যাসীয় পদার্থের কয়েকটি পরমাণুকে দেখানো হয়েছে। a-র তাপমাত্রা সবথেকে বেশীযেমন ঘরের - তামপাত্রার কাছে, আর c-এর তাপমাত্রা সবথেকে কম, ন্যানোকেলভিনের কাছে।)

পার্টিকেল-বৃষ্টির ফোঁটা-বাস-ট্রামের মত বড় বস্তুর ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তার মান নগন্য। গ্যাসের অণু-পরমাণুর মত ছোট কণিকার ক্ষেত্রেও ঘরের তাপমাত্রায় এই অনিশ্চয়তার মান নগন্য। কিন্তু কম তাপমাত্রায় এই নীতিকে আর অগ্রাহ্য করা যায় না। তখন অণু-পরমাণুদের কণা হিসেবে ধরাই ভুল। ভাবতে হয় তরঙ্গ হিসেবে। ঠিক যেমন তরঙ্গ এক বিন্দুতে সীমাবদ্ধ থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে, অণু-পরমাণুগুলোও সেরকম। তাদেরও একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে বর্ণনা করা যায়। এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাপমাত্রা কমার সাথে সাথে বাড়তে থাকে। তাপমাত্রা কমতে কমতে একসময় এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য অণু-পরমাণুদের মধ্যে গড় দূরত্বের সমান হয়ে পড়ে। তখন একটার তরঙ্গ এসে পড়ে আরেকটার গায়ে। তাদের আর আলাদা করে চেনা যায় না – identity crisis বা পরিচয় সংকট হয়।

এই পরিচয় সংকটে অণু বা পরমানুগুলো কেমন আচরণ করবে তা নির্ভর করে তারা বোসন না ফার্মিয়ন তার উপর। মহাবিশ্বের সব মূলকণাকে (Fundamental particles) বোসন আর ফার্মিয়ন এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বোসন-রা একই অবস্থায় (quantum state) থাকতে পছন্দ করে। যেমন, আলোর কণিকা ফোটন হল বোসন - তাই একই কম্পাঙ্কের অনেক ফোটনকে একসাথে এনে লেজার বানানো সম্ভব। অন্যদিকে ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন হল ফার্মিয়ন। দুটো ফার্মিয়নকে একই জায়গায় একই কোয়ান্টাম স্টেট-এ আনা অসম্ভব। তাই যেকোন পদার্থের মধ্যে এমনকি বিশালাকার নিউট্রন তারার (Neutron star) প্রবল মহাকর্ষের মধ্যেও ফার্মিয়নরা একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। জোড় সংখ্যায় ফার্মিয়ন মিলে আবার বোসনের মত আচরণ করে – যেমন একধরণের সোডিয়াম পরমাণুর মধ্যে (Na-23 আইসোটোপ) ইলেক্ট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন মিলে মোট 34 টা ফার্মিয়ন – জোড়সংখ্যক, সুতরাং এই সোডিয়াম পরমাণুগুলো বোসন।

ন্যানোকেলভিন তাপমাত্রার কাছে এসে যখন এই বোসন পরমাণুগুলোকে আর আলাদা করে চেনা যায় না, তখন তারা সবাই মিলে পদার্থের এক নতুন অবস্থা তৈরী করে – যার নাম বোস-আইনশটাইন কনডেনসেট (Bose-Einstein condensate)। এই অবস্থায় তাদের আচরণে এক অভূতপূর্ব সংগতি (coherence) দেখা যায়, যেন তারা কুচকাওয়াজরত সৈন্যের দল – সবাই একই তালে একই রকমভাবে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। সবাই সব জায়গায় রয়েছে – সব কটা পরমাণু মিলে যেন একটা মহা-পরমাণু হয়ে গিয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গবেষণার উপর ভিত্তি করে আইনস্টাইন পদার্থের এই অবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করেন 1924 সাল নাগাদ। তখন হয়ত তাঁরা ভাবতে পারেননি যে একদিন পরীক্ষাগারে সত্যিই পদার্থকে পরমশূন্যের কাছে ঠান্ডা করা যাবে আর এই অবস্থা তৈরী করা যাবে। বহু বছরের বহু বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টার ফলে 1995 সালে পরীক্ষাগারে বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট তৈরী হল। উলফগ্যাং কেটারলী, কার্ল ওয়াইম্যান আর এরিক কর্ণেল এর জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন 2001 সালে। এখন পৃথিবীর বহু পরীক্ষাগারে অনেক পদার্থের (যেমন রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, লিথিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম, আরবিয়াম, স্ট্রনটিয়াম, পটাশিয়াম, ক্রোমিয়াম ও ক্যালসিয়ামের বোসন আইসোটোপ) এই অবস্থা তৈরী করা সম্ভব হয়েছে – ভারতেও টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (মুম্বাই) আর পুণে IISER-এ বোস-আইনশটাইন কনডেনসেট তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে পৌঁছনোর ফলে বিজ্ঞানীদের কাছে এক নতুন জগৎ খুলে গিয়েছে। তার নাম কোয়ান্টাম জগৎ। সে জগত রোমাঞ্চকর, বিস্ময়ে ভরা! সেখানে একটা পরমাণু একসাথে অনেক জায়গায় থাকতে পারে। আবার অনেক পরমাণু মিলে অদ্ভুত সব অবস্থা তৈরী করতে পারে। হাজারে হাজারে বিজ্ঞানী সেই জগতকে বোঝার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সে কাজ খুব দুরূহ, সবথেকে শক্তিশালী কম্প্যুটারও হার মেনে যাচ্ছে। তাই বিজ্ঞানীরা মিলে এমন কম্প্যুটার বানানোর চেষ্টা করছেন যার মধ্যে গণনার জন্যই ব্যবহার করা হবে পরমশূন্য তাপমাত্রার কাছে থাকা কোয়ান্টাম পদার্থ! সেই কোয়ান্টাম কম্প্যুটার হতে পারে অসম্ভব শক্তিশালী। পালটে দিতে পারে মানব সভ্যতা!

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন

http://bigyan.org.in/2015/03/29/paramshunyo-tapmatrar-kachhe-3/

প্রচ্ছদের কোলাজে বোস-আইনশটাইন কনডেনশেসনের আবিষ্কারের সাথে যুক্ত কিছু বিজ্ঞানীর ছবি – উপরে বামদিক থেকে শুরু করে ঘড়ির কাঁটার দিকে : সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অ্যালবার্ট আইনশটাইন, উলফগ্যাঙ্গ কেটারলী, কার্ল ওয়াইম্যান, এরিক কর্ণেল। সেই সাথে কন্ডেনসেটে পরমাণুর বেগের ডিসট্রিবিউশন আর আবহে ঘূর্ণমান বোস-আইনশটাইন কন্ডেনসেটের 'ভর্টেক্স ল্যাটিস'। ছবিগুলোর উৎস : নোবেল কমিটি, এম. আই. টি ও কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট। সত্যেন বোস ও আইনশটাইনের ছবি ইন্টারনেট থেকে পাওয়া, কপিরাইট নেই।

মহাবিশ্বের প্রথম আলো

সুপ্রতীক পাল

অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট

না মশাই, এ আলো সে আলো নয়। সে তো ছিল জ্ঞানের আলো, ইনি বিজ্ঞানের - যার গালভরা নাম ফোটন।

ও। বুঝেছি। তা আলো তো আলোই। সুইচ টিপলাম জ্বলে উঠল, নেবালাম নিবে গেল। ব্যাস। তার আবার প্রথমশেষের কি আছে মশাই-?

আছে আছে - এই আলোর সঙ্গে কুস্তি করে কত বিজ্ঞানীর যে গাত্রে হল ব্যথা, তা জানেন?

বলেন কি! এ তো রীতিমতো আলোবাজি! তা কে বটে আপনি? প্র-ফে-সা-র নিধিরাম পাটকেল বুঝি?

চিনতে পেরেছেন যা-হোক! ভাবলাম বুঝি আজকালকার ছেলেছোকরারা আমায় ভুলেই মেরে দিয়েছে। আচ্ছা, এ আলোর বয়েস কত বলুন দেখি?

বাড়তি না কমতি?

এখানে তো বাড়তির হিসেবই করতে হবে মশাই। সময় যে শুধু সামনের দিকেই পা বাড়িয়ে।

কত আর? একশ? হাজার বছর?

উমম… ঠিকঠাক বলতে হলে ১৩.৮ বিলিয়ন বছর।

দাঁড়ান মশাই, হিসেব কষি। আগে দেখি অঙ্কটা ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ! মিলিয়ন হলো গিয়ে ১০ লাখ আর বিলিয়ন তার হাজার গুন। তার মানে দাঁড়ালো গিয়ে ১৩,৮০০,০০০,০০০ বছর!

ভেবেই দেখুন তাহলে। প্রথম নক্ষত্র — যার জন্ম কিনা আরো ৪০০ মিলিয়ন বছর পরে — তার জন্ম এই প্রথম আলোর কত পরে! আর আমরা তো সেদিনের শিশু।

তা এই আদি পিতামহ ভীষ্ম-আলো নিশ্চয়ই বয়সের ভারে চলচ্ছক্তিরহিত?

হবে হয়তো। তবে ভদ্রলোক এখন যে গতিতে যাতায়াত করেন, তা হলো সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার।

বলেন কি মশাই! এই যে শুনলুম জাপানে একটা ট্রেন বানিয়েছে যা নাকি ঘন্টায় ৬০০ কিলোমিটার বেগে ছুটবে বলে তোলপাড়, আর এই বৃদ্ধ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার!

হুম!

কিন্তু প্রফেসর পাটকেল, আপনি কি বলতে চান এই প্রাচীন আলোর আগে আর কোনো আলো, থুড়ি ফোটন ছিল না?

ছিল তো। ফোটন ছিল। তবে তা আলো হয়ে ওঠেনি তখনো।

ওঃ। এতে আর অবাক হবার কি আছে? ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। ছিল ডিম, হয়ে গেল একটা প্যাঁকপ্যাঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।

ঠিক তাই। সেই ফোটন তখন ছিল আরো অনেক আয়নের সাথে গলাগলি করে একঘরে বন্দী - যাকে বলে প্লাসমা দশা। তখন ছিল সবটাই অন্ধকার - হবেই তো, ফোটনকে যে আয়নগুলো বেঁধে রেখেছিল এক ধরণের নিউক্লীয় শক্তিতে। তবে আয়নের স্বভাব তো আপনি দিব্যি বোঝেন। যেই-না মহাবিশ্ব খানিক বড় আর ঠান্ডা হয়েছে, অমনি আয়নগুলো গুটি গুটি পায়ে কাছাকাছি এসে ঘর বাঁধতে শুরু করেছে - যেমন করে ইলেক্ট্রন আর প্রোটন মিলে হাইড্রোজেন এটম তৈরী করে আর কি। ফোটনও করেছে কি, তাকে আটকে রাখার লোক কমতে শুরু করেছে দেখেই সেই সুযোগে ঘর ছেড়ে পালানোর মতলব এঁটেছে। এমনি করে এক সময় যেই-না তার বাঁধন গেছে টুটে (বিজ্ঞানীরা বলেন, Mean free path বা গড় মুক্তি পথ অনেক বেড়ে গেছে। তা ওদের কথা ছাড়ুন।), অমনি সে সংসারের মায়ার বন্ধন কাটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে একা বাউল একতারা নিয়ে। তখন থেকে তার নাম হল আলো। এই যে শেষবারের মত আয়নের সাথে তার মুলাকাত ঘুচলো একে বলে শেষ বিক্ষেপণ (last scattering) - আর এই প্রথম আলো হয়ে যে আকাশ আমাদের চেতনার রঙে রাঙিয়ে দিল, সে আকাশকে বলা হয় শেষ বিক্ষেপণ তল (last scattering surface)! দেখতে এই রকম:

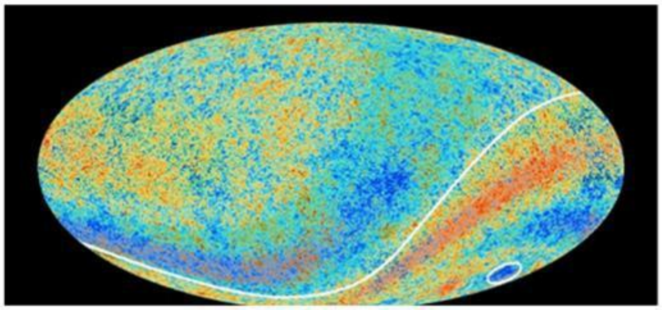

(চিত্রের ঋণস্বীকার: Planck টেলিস্কোপ)

তাই? এই আলোকেই বুঝি আমরা ভোর বেলা পুব আকাশে দেখি?

ধুর মশাই! এই যে বললাম পুব আকাশের সূর্যও সেদিনের শিশু। এই প্রথম আলো খালি চোখে দেখাই যায় না। এদের তরঙ্গগুলো একটু বড় তো। এক একটা তরঙ্গ ২ মিলিমিটার লম্বা। ভাবছেন এ আর এমন কি? তবে বলি, খালি চোখে যে আলো দেখেন এরা তার প্রায় দশ হাজার গুন লম্বা। এদের বলে মাইক্রোওয়েভ।

মাইক্রোওয়েভ? মানে বাড়িতে.....

হুম। বাড়িতে যে ওভেনে হামেশাই কলাটা-মুলোটা রান্না করে খান, সেই রান্নার আঁচ যারা তৈরী করে, এরা সেই দলের। এদের দেখতে দরকার হয় টেলিস্কোপ।

আমাদের ইস্কুলের ছাদে যে টেলিস্কোপ লাগানো আছে, সেই রকম?

ওতে তো সাধারণ আলো দেখেন। এই অপটিক্যাল টেলিস্কোপের সামনে এরা লুকিয়ে থাকে গ্রহ-নক্ষত্রের আলোর অন্তরালে - যেমনভাবে রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে। এদের ধরতে বানাতে হয় বিশেষরকমের টেলিস্কোপ। এরা নিতান্তই আকস্মিকভাবে ধরা দিয়েছিল ১৯৬৫ সালে পেনজিয়াস আর উইলসন নামে দুই বিজ্ঞানীর চোখে, থুড়ি রেডিও টেলিস্কোপ-এ। ওরা তো প্রথমে একে বাজে গল্প বলে প্রায় উড়িয়েই দিয়েছিলেন আর কি! পেপারটাও ছাপিয়েছিলেন সেই ভেবেই, খুব নগণ্য একটা শিরোনাম দিয়ে। হঠাত কি মনে হল, এদের নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলেন, এরা সবাই মিলে তৈরী করছে একটা ব্ল্যাকবডি বর্ণালী (Blackbody spectrum)! আচ্ছা তা না হয় না-ই বুঝলেন, এর মানেটা তো বুঝবেন? এর থেকে বলা যায় ওই সব প্রাচীন ফোটনগুলো যখন প্রথম আলো হয়ে দেখা দিল, সেই শেষ বিক্ষেপণ তল-এর তাপমাত্রা সবদিকে সমান - কোনো উনিশ-বিশ নেই। যেন 'আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে'।

আপনি যে মশাই কবি হলেন দেখছি! তা এই তাপমাত্রাটা কত তার হিসেব কি আপনার বিজ্ঞানীরা কিছু দিলেন?

দিলেন বই কি। তাও তাঁরা মেপে ফেললেন সঠিকভাবে। আসলে প্রায় ৩০০০ কেলভিন (কেলভিন জানেন তো? ঐ সেন্টিগ্রেড-এর থেকে ২৭৩ ডিগ্রী বাড়িয়ে হিসেব করুন না, তাহলেই হবে), কিন্তু মহাবিশ্বের সবচেয়ে দূর থেকে আসে বলে তা কমে দাঁড়ায় ২.৭২৫ কেলভিন, অর্থাৎ মোটামুটি মাইনাস ২৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এর নাম দেওয়া হল কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (Cosmic Microwave Background), আর ডাকনাম CMB - কেন, তা এতক্ষণে কি আর বুঝতে আপনার বাকি আছে? তা যাক গে, মোদ্দা কথা হলো তাপমাত্রা সবদিকে সমান - কোনো উনিশ-বিশ নেই!

ক্যাডাভারাস কান্ড মশাই ! সাম্যবাদের গুরুও চমকে উঠতেন!

তবে আর বলছি কি? এরপর গোলাগুলির মত এসে পড়ল আরো অনেক টেলিস্কোপ - COBE, WMAP, Planck - আরো কত। যেমন ধরুন এই হল এরকম এক আধুনিক টেলিস্কোপ-এর চেহারা:

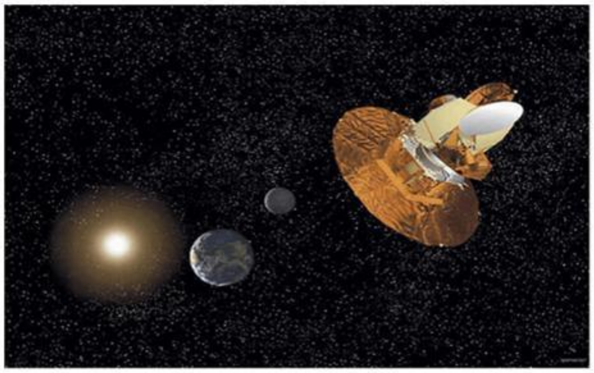

(চিত্রের ঋণস্বীকার: WMAP টেলিস্কোপ)

ঠিক ধরেছেন মশাই, এ হল স্যাটেলাইট। ঠিক এটা নয়, কিন্তু এরকম কোনো এক স্যাটেলাইট-এর দৌলতেই তো আপনি বাড়িতে বসে দিব্যি টিভিও দেখছেন, আবার আজ বিকেলে ছাতা নিয়ে বেরোবেন কিনা তাও জেনে যাচ্ছেন।

কিন্তু কেন? একটাই তো দিব্যি ছিল। আরও টেলিস্কোপ কি হবে? খামোখা টাকার শ্রাদ্ধ!

আরে রোসো। আপনার দেখছি মুজতবা সাহেবের ভাষায় 'অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর' দশা! তা এই যে এত রকম টেলিস্কোপ যন্ত্রপাতি কম্পিউটার লটবহর নিয়ে হুলুস্থুলু কান্ড - আর কিছু পাগলের আলোর সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে ব্যথা করা - এর কিছু কারণ আছে তো। নতুন টেলিস্কোপগুলো করল কি, আরো অনেক কিছুর সাথে বাড়াতে লাগল রেজোলিউশান, আপনারা যাকে বলেন পিক্সেল (pixel)। আর পিক্সেল তো মশাই আপনি দিব্যি চেনেন - এই যে সেবার ভাবলেন বন্দাকুশ পাহাড়ে হ্যাংলাথেরিয়ামের ছবিটা তুলে নিয়ে এসে বড়াই করে সকলকে বলবেন "এটা হেঁসোরাম হুসিয়ারের তোলা ছবির চেয়ে ঢের ভালো" - তা আপনার ক্যামেরার বেশি পিক্সেল-এর দৌলতেই তো। তা এই টেলিস্কোপগুলোতে পিক্সেল বাড়িয়ে দেখা গেল তাপমাত্রা সবদিকে সমান বটে, তবে একটুখানি উনিশ-বিশ আছে। সামান্য - অতি সামান্য। কতটা? তারও সঠিক হিসেব পাওয়া যায় বৈ কি - সবচেয়ে বেশি তফাৎ হতে পারে ২০০ মাইক্রো-কেলভিনের মত - মাইক্রো মানে জানেন তো? দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। সামান্য তো বটেই।

তা মশাই, এতই যদি সামান্য তো তার কথা না ভাবলেই তো হল - ল্যাঠা চুকে গেল।

ঐ সামান্যটুকুই যে সোনার চেয়েও দামী। বিশ্বাস না হয় বলি, ওটুকু না থাকলে যে আপনিই থাকতেন না মশাই! ওই সামান্য তফাতেই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর জন্ম এবং স্থিতি। কে কতটা আছে তারও সঠিক হিসেব করে ফেলা যায় ওই সামান্য তাপমাত্রার তফাত থেকেই। আর মজার ব্যাপারটা এখানেই। এই যে সূর্য-তারা-গ্রহ-নক্ষত্র-ছায়াপথ যা কিছু আমরা দেখছি, মায় আমরা অব্দি, মহাবিশ্বের মাত্র - মাত্রই - চার শতাংশ জুড়ে আছে।

বলেন কি? এই এত কিছু মিলিয়ে মাত্র চার শতাংশ?

তবে আর বলছি কি !

বাকিটা বুঝি খালি? মানে মহাশূন্য?

খালি কিন্তু খালি নয়।

আবার হেঁয়ালি?

না না, বাকিটাকে আমরা সোজাসুজি দেখতে পাই নি এখনো অব্দি - এই যা। তবে তারা আছে, ঘোরতর আছে - তারই প্রভাব পড়ে CMB আর আরো অনেক পরীক্ষানিরীক্ষায়। তার একটা অংশ (প্রায় ২৬ শতাংশ) হলো ডার্ক ম্যাটার - যে না থাকলে ফোটন সংসার ছেড়ে চলে আসার পর থেকে আজ অব্দি বিশ্বটা ঠিক এরকম দেখতে হত না (সোজা কথায় আপনি এই মুহুর্তে এভাবে থাকতেন না) । আর প্রায় ৭০ শতাংশ হলো ডার্ক এনার্জি - যার জন্য আমাদের বিশ্ব শুধু বাড়ছেই না, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, মানে বৃদ্ধির বেগ ত্বরান্বিত হচ্ছে। তা এই দুই মক্কেলকে নিয়ে পরে একদিন বিশদে বলা যাবে 'খন।

আরো কিছু পাওয়া যায় নাকি?

যায় বৈ কি ! তা ধরুন আলো যখন আছে, এবং আলো মানেই যখন তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ, তখন পিছে পিছে ভাই লক্ষ্মণ - যাকে বলে পোলারাইজেসন (polarization) - সে তো হাজির হবেই। পালাবেন কোথায়? আরে আরে আরে, ঘাবড়াবেন না। সহজ করেই বলি। এটা এমন একটা ধর্ম যা আলোর তড়িৎ (মানে E-mode) আর চৌম্বকীয় (B-mode) ধর্মকে আলাদা করে দেখায়। এই যে আপনারা আজকাল দামী সানগ্লাস পরেন, ওতেই থাকে। আর আজ সকালেই যে ক্যামেরায় ভোরের গাঢ় নীল আকাশের ছবি ফিল্টার করে ফেসবুক-এ লাগালেন, এও তো সেই পোলারয়েড -এর কারসাজি।

তাহলে তো মশাই এই পোলারাইজেসন থাকা উচিত সেই প্রাচীন আলোর মধ্যেও।

বিলক্ষণ! আর কি আশ্চর্য! আমাদের আজকের টেলিস্কোপ তাকে খুঁজেও পেয়েছে - তবে অর্ধেকটা, অর্থাৎ E-mode কে।

আর B-mode?

না মশাই, তিনি এখনো অধরাই। তাঁকে ধরতে বিজ্ঞানীরা তৈরী করছেন আরো উন্নত যন্ত্র। চলছে দুরূহ পরীক্ষানিরীক্ষা। তাঁদের আশা একদিন না একদিন তিনি ধরা দেবেনই।

তা এই অধরা মাধুরীকে পেয়ে কি হবে?

হবে ভারী মজার ব্যাপার। মহাকর্ষেরও যে তরঙ্গধর্ম আছে তা প্রমাণ হবে। আর আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ - যা কিনা এই মহাবিশ্বের যাবতীয় বড় বড় কর্মযজ্ঞের ব্যাখ্যা দেয় - তা আরো গভীরভাবে সত্যি বলে প্রমাণ হবে।

সবই তো বুঝলুম। কিন্তু এসব জেনে আমার কোন উপকারে আসবে মশাই?

ঐখানেই তো বুঝভম্বুল দাদা। যদি বলি, এই যে আপনার গাড়িতে জি.পি.এস. লাগিয়ে দিব্যি অচেনা রাস্তার ডাইনে-বাঁয়ে চিনে নিচ্ছেন - আচ্ছা না-হয় গাড়ি ছাড়ুন, আপনার স্মার্টফোনেও তো জি.পি.এস. আছে দেখছি - এই জি.পি.এস. যে এত নির্ভুলভাবে আপনাকে খবর দেয়, তার হিসেব কোথা থেকে করা হয় জানেন? যাকে এইমাত্র বইপোকা বলে দূরছাই করছিলেন, সেই আপেক্ষিকতাবাদ থেকে। হিসেবের একটু ভুলচুক হলেই যে পথ ভুল করে এসে পড়বেন আমড়াতলার মোড়ে, তখন?

(উপসংহার: আপনারা ভাবতে থাকুন। আজকের মত প্রফেসর পাটকেল বিদায় নিলেন। তবে আশা রাখা যায় আবার কোনদিন তিনি ধাঁ করে এসে পড়বেন তাঁর মহাবিশ্বের বিস্ময় নিয়ে।)

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2015/06/22/first-light/

(লেখাটি ২২-এ জুন ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)

প্রচ্ছদের কোলাজ: সূর্যকান্ত শাসমল

ছবির উৎস:
http://sukumarray.freehostia.com/view.php?cat_id=2&article_id=159
http://aether.lbl.gov/www/projects/cobe/COBE_Home/cmb_fluctuations_big.gif

খেলাচ্ছলে প্রোগ্রামিং

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

গবেষণায় অবাধ স্বাধীনতা যে কোনো গবেষকের কাছে হাতে চাঁদ পাওয়ার মত। কিছু গবেষণাগার আছে যেখানে এই স্বপ্নের খুব কাছাকাছি পৌঁছনো যায়। **MIT মিডিয়া ল্যাব** তার মধ্যে অন্যতম। নিজের আইডিয়ার পিছনে বিনা বাধায় লেগে থাকতে পারলে কোথায় পৌঁছনো যায়, এই মিডিয়া ল্যাব তারই নিদর্শন। প্রস্থেটিক পা থেকে শুরু আকার পরিবর্তনক্ষম টেবিল, রোবোটিক অপেরা থেকে থালাবাটির কীবোর্ড - এখানে কিছুক্ষণ কাটালে কল্পবিজ্ঞান আর বাস্তবের মধ্যে তফাৎ করা কঠিন হয়ে যায়। এই মিডিয়া ল্যাবের **সায়মিন্দু দাশগুপ্তর** সাথে আমরা এক আলোচনায় বসলাম। সেই আলোচনায় কিছু ইতিহাস উঠে এলো, জানলাম মিডিয়া ল্যাবের কিছু বর্তমান প্রজেক্টের কথা। আজকের গল্প একটা বিশেষ প্রজেক্টকে নিয়ে, যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা আমূল পাল্টে দেবে।

এটা নিঃসন্দেহে সত্যি যে জেনারেশন ওয়াই কম্পিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া করাতে তার আগের প্রজন্মের থেকে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে এবং পরবর্তী প্রজন্ম আরো অল্প বয়েসেই তুখোড় হয়ে উঠবে নিশ্চিতরূপে। কিন্তু তুখোড় হওয়া মানে কি? তারা পটাপট ইন্টারনেট ঘেঁটে যেকোনো তথ্য বার করে দিতে পারবে, বা রকমারি অ্যাপ ব্যবহার করে অনেক নিত্যনৈমিত্তিক ঝঞ্ঝাট থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কিন্তু তার বাইরে, যদি রেডিমেড সমাধান না খুঁজে নিজে থেকে একটা প্রোগ্রাম অথবা অ্যাপ বানাতে বলা হয় তাহলে ক'জন বলতে পারবেন - কুছ পরোয়া নেহি, নামিয়ে দিচ্ছি? কই, হাত তুলুন তো দেখি!

প্রোগ্রামিংয়ের জুজুর সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। একে তো অপরিচিত কিম্ভূত-নিয়মে-ভরা ভাষা, ভাষার প্রয়োগে একচুল এদিক ওদিক হলে

প্রোগ্রাম আর কাজ করবে না। কেন কাজ করছে না, তা জানানো হবে ঠিকই, কিন্তু যা জানানো হবে, তার থেকে গলদটা খুঁজে বার করতেই জান কয়লা হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই, স্কুলের পাঠ্যক্রমে ঘাড় ধরে না শেখালে নিজে থেকে প্রোগ্রামিং শেখার উৎসাহ পাওয়া কঠিন। MIT মিডিয়া ল্যাব এই কঠিন কাজটাকে সহজ এবং মজাদার করার এক অভিনব উপায় ভেবেছে, যার নাম **স্ক্র্যাচ**।

চট করে দেখলে, "স্ক্র্যাচ"-কে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা বলে মনেই হবে না। ধরা যাক, আপনি একটা নতুন প্রোগ্রাম লিখতে শুরু করলেন। প্রথমেই পর্দায় দেখবেন একটা বেড়াল। আপনার প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো, বেড়ালটাকে দিয়ে যা খুশি তাই করানো।

কেমনভাবে করানো হবে? আসল মজাটা সেখানেই। হাতে মজুত কয়েকটা বিশেষ আকারের ব্লক, যেগুলো একটার গায়ে আরেকটা চাপানো যায়। যেমন, একটা ব্লক নির্দেশ দিচ্ছে, একশো পা এগোন।

আরেকটা ব্লক বলছে, ৩ সেকেন্ড অপেক্ষা করুন।

আরেকটা বলছে, ৯০ ডিগ্রী ঘুরে দাঁড়ান।

এবার এদের একটার ঘাড়ে আরেকটাকে চাপিয়ে তাদের উপর ক্লিক করলেই বেড়ালবাবাজি একশো পা হেঁটে তিন সেকেন্ড পর রাইট টার্ন নেবে।

এবার এই তিনটে ব্লকের সমষ্টিকে আর একটা চতুর্থ হাঁ করে থাকা ব্লকের মধ্যে গুঁজে দেওয়া যায়। চতুর্থ এই ব্লকটা বলছে, কাজটা দশবার করুন।

জিনিসটা দাঁড়াবে এইরকম। লক্ষ্য করুন, আরেকটা অপেক্ষা করার ব্লক গুঁজে দেওয়া হলো যাতে সবকটা ব্লকের প্রভাব আলাদা আলাদা করে বোঝা যায়।

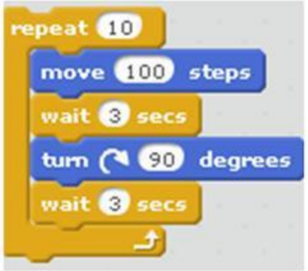

এবার ক্লিক করুন এতে। বেচারা বেড়াল একটা অদৃশ্য চতুষ্কোণের চারিদিকে ঘুরপাক খাবে আড়াই বার।

বেড়ালবাবাজিকে কলুর বলদ বানিয়ে নিজের অজান্তেই কিন্তু আপনি শিখে গেছেন প্রোগ্রামারদের চেনাপরিচিত একটা কনসেপ্ট বা ধারণা — যাকে বলে "লুপ"। যার অর্থ দাঁড়ায় একই কাজের বারংবার পুনরাবৃত্তি। এক্ষেত্রে আপনি শুধু শিখছেনই না, চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতেও

পাচ্ছেন। এবার বেড়ালের বদলে বসিয়ে দিন পছন্দসই চরিত্র (যাকে স্ক্র্যাচ টীম নাম দিয়েছে "স্প্রাইট"), তাকে ইচ্ছেমত নাচনকোঁদন করান, চান তো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বা সিনারি জুড়ে দিন তাতে – একটা ছোটখাটো অ্যানিমেশন কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরী।

এইবার বলুন, একজন ইস্কুলের ছাত্র এইভাবে প্রোগ্রামিং শিখতে চাইবে, না "দশগন্ডা মৌলিক সংখ্যা কি ফিবোনাচি সেকুএন্সের (Fibonacci Sequence) যোগফল?" বার করে শিখতে চাইবে।

এই ধরণের একটা উপলব্ধি থেকেই 'স্ক্র্যাচ'-এর জন্ম। আশির দশকে যখন পার্সোনাল কম্পিউটার বা পি.সি. এলো, তখন ভাবা হয়েছিল শিক্ষার জগতে একটা বিপ্লব আসবে। বিপ্লব হয়তো এসেছে, কিন্তু শিক্ষার জগতে নয়। আজও ভাবা হয়, প্রোগ্রামিং শেখার একটা বড় উদ্দেশ্য আখেরে সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি। প্রোগ্রামিংয়ের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করার সাবলীলতা বা স্বাচ্ছন্দ্য এখনো অনেকেরেই হাতের বাইরে।

এর কারণ খুঁজতে গিয়ে, কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল।

১) প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় দুর্বোধ্য নিয়মের কড়াকড়ি। কোথায় সেমিকোলন পড়বে, আর কোথায় নয়, সেটা বুঝতে বুঝতেই শেখার ইচ্ছেটা মরে যায়।

২) ভাষার প্রয়োগে কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছের জায়গা নেই। কিছু আপাত রসহীন সমস্যার সমাধান করাই যেন প্রোগ্রামিংয়ের লক্ষ্য, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তার।

৩) যেভাবে প্রোগ্রামিং, ইস্কুলের বাঁধাধরা কারিকুলাম মেনে শেখানো হয়, সেখানে খুটখাট করে এক্সপেরিমেন্ট করার জায়গা নেই। এক ঘণ্টার পিরিয়ডে চারটে প্রোগ্রাম নামাতে হবে!

সায়মিন্দু আমাদের দুটো ছোটবেলার অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দিলো। তার মধ্যে একটা হলো, কাগজে কলমে প্রোগ্রাম লেখা। "এটা যে কি অস্বাভাবিক জিনিস, বলে বোঝানো মুস্কিল। তাবড় তাবড় প্রোগ্রামারদেরও প্রথম সংস্করণটা নির্ভুল হয়না। প্রোগ্রাম চালিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ডিবাগ করে তবে সেটা দাঁড়ায়। অথচ, ইস্কুলে আশা এই যে কাগজে কলমে প্রথম চেষ্টাতেই নিখুঁত প্রোগ্রাম বেরিয়ে আসবে।" আরেকটা সমস্যা, ইস্কুলে যথেষ্ট সংখ্যক কম্পিউটার থাকে না। একটা কম্পিউটারে চার পাঁচজনকে বসিয়ে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই একজন কোড করে, বাকিরা চেয়ে চেয়ে দেখে। চেয়ে চেয়ে দেখে কতটা শেখা যায়, সেটা না বলাই ভালো।

শিক্ষাপ্রদানের পন্থা বদলানো একটা ভিন্ন চ্যালেঞ্জ। কিন্তু, প্রোগ্রামিং ভাষা শেখার যে প্রতিবন্ধকতা ভাষার মধ্যেই আছে, তাকে অনেকটা দূর করেছে 'স্ক্র্যাচ'। চেষ্টা ছিল এমন একটা ভাষা তৈরী করা, যার জমি থাকবে অনেক নিচে, ছাত অনেক উপরে আর নড়াচড়া করার অনেকটা জায়গা থাকবে। অর্থাৎ, শেখা যাবে চটপট, একবার শিখলে প্যাঁচালো থেকে প্যাঁচালোতর কাজে লাগানো যাবে, আর সামনের বেঞ্চের প্রথমেশ থেকে পিছনের বেঞ্চের লাল্টুবিল্টু – সকলেই নিজের মত শেখার রাস্তা খুঁজে নিতে পারবে।

নতুন ভাষাটার সাফল্য এখানেই যে সেটা উপরের সব দিকগুলিই মাথায় রাখতে পেরেছে। বিশেষ করে - ভিন্ন শিক্ষার্থীর ভিন্ন শেখার স্টাইলকে

জায়গা দিতে পেরেছে। সায়মিন্দুর কথায় – "যার ছবি আঁকতে ঝোঁক, সে ছবি আঁকতে আঁকতে কিছু প্রোগ্রামিং শিখে নিল। যার প্রোগ্রামিংয়ের শখ, সে একটু ছবি এঁকে নিল।" দুজনেই কিন্তু ভবিষ্যতের আই.টি. সেক্টরের কর্ণধার হওয়ার কথা ভাবছে না। নিজের মধ্যে সুপ্ত একটা খুদে স্রষ্টা বা শিল্পীকে বাইরে টেনে আনছে মাত্র। তাদের যেটা ভালো লাগে, এমন কাজের মাধ্যমে শিখছে তারা – তা সে গেম বানানোই হোক কি গল্প বলাই হোক। কোন দুঃখে একটা হ-জ-ব-র-ল ভাষা শেখার চেষ্টা করছি, সেই প্রশ্ন তাদের মাথাতেও আসছে না।

ব্যাপারটা সহজ ভাবে বোঝাতে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক:

- একবার একটা ১৩ বছরের ছেলে একটা গেম বানিয়েছিলো, কিন্তু কিভাবে স্কোর রাখবে সেটা বুঝতে পারছিল না। 'স্ক্র্যাচ' টীম-এর এক প্রফেসর তাকে শেখালো 'স্ক্র্যাচ'-এ ভেরিয়েবিল কি করে বানাতে হয়। ছেলেটা তো মহা খুশি, প্রফেসরকে ধন্যবাদের বন্যায় ভাসিয়ে দিল। পরে প্রফেসর ভাবছিলেন, এরকম কস্মিনকালেও হয়েছে কি যে বীজগণিত ক্লাসে ভেরিয়েবিল শিখে ছাত্র এতটা খুশি হয়ে গেছে!

- কিম্বা ধরা যাক, যামিনী রায় স্টাইলে পেইন্টিং নিয়ে এই প্রজেক্টটা। দেখা যাচ্ছে, স্রষ্টার আঁকার দিকে ঝোঁক বেশি (এবং আঁকার হাতটাও দিব্যি)। 'স্ক্র্যাচ'-এর নির্মাতারা বলে, হোক না, তাতে ক্ষতি কি? যে যেভাবে স্বচ্ছন্দ বোধ করে, সেইদিক থেকেই আসুক না! এমন আঁকার হাত যার, তাকে ক্লাসে জায়গা দেওয়া হবে না, এ কেমন কথা?

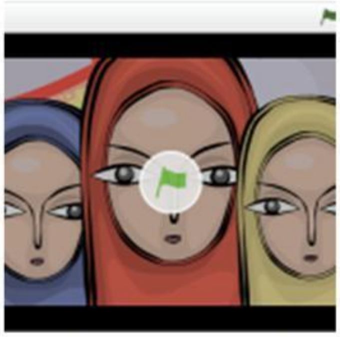

- এই প্রজেক্টটা বানিয়েছে বেঙ্গালুরুর একটা ছেলে। ভূগোল ক্লাসে সে শিখেছিল পৃথিবীর নিচে অনেকগুলো স্তর আছে, যারা একে অপরের সাপেক্ষে নড়াচড়া করে। এটা শুনে তার মনে কি ভাব জেগে উঠলো, সেটা সে মহা উৎসাহের সাথে সবাইকে বললো এই অ্যানিমেশনটার মাধ্যমে। মিউজিক, নেপথ্য-কন্ঠ, আরো নানান খুঁটিনাটি দিয়ে ভরাট এই অ্যানিমেশনটা একটা বারো বছরের ছেলে বানিয়েছে, এটা ভাবলেই অবাক লাগে!

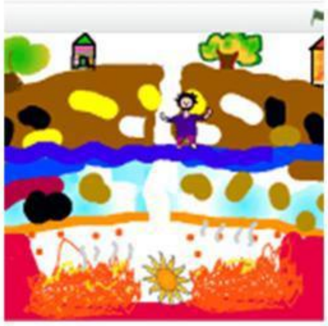

- এখানে দেখতে পাবেন, নানারকম উৎসবের একটা সংকলন। বাচ্চারা দেদার আনন্দে বছরের প্রিয় সময়গুলোর কথা বয়ান করেছে এখানে।

অতএব দেখতেই পাচ্ছেন, কম্পিউটার ল্যাবে সপ্তাহে এক কি দু ঘন্টার পিরিয়ডে যা শেখা যায়, তার থেকে অনেক জটিল জিনিস শিখছে এই শিশুরা! শিখতে পারছে, কারণ তারা এমন কিছু একটা তৈরী করছে, যার একটা গভীর অর্থ আছে তাদের কাছে!

এছাড়া, ভাষাটাও যত কম খটমট করা যায়, তার চেষ্টা করা হয়েছে। যাকে বলে সিনট্যাক্স এরর বা ব্যাকরণের গলদ, সেগুলো করা খুব কঠিন। ব্লকগুলো খাপে খাপে না বসলেই আপনি বুঝে যাবেন, কোথাও গোলমাল করছেন। যেমন, যেসব ব্লক নির্ধারণ করে কাজগুলো কখন বা কতবার হবে, তারা হাঁ করে থাকে, যাতে তাদের হাঁ করে থাকা মুখে সেই কাজের ব্লকগুলোকে গুঁজে দেওয়া যায়।

আরেকটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। এইসব ব্লকে একটা ষড়ভুজ আকারের খোপ আছে। সেখানে বসবে যাকে বলে কন্ডিশন বা শর্ত। যে শর্ত পূরণ হলে ওই হাঁ করে থাকা ব্লকের ভিতরের কাজগুলো শুরু বা শেষ হবে। এবার ওই ষড়ভুজ আকারের খোপে আরেকটা ষড়ভুজ আকারের ব্লককেই বসানো যায়, যাকে তাকে বসানো যায়না। আমরা যারা প্রোগ্রামিং করেছি, তারা জানি শর্তটা একটা হ্যাঁ-না প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আসবে। যাকে বলে বুলিয়ান ভ্যালু। হ্যাঁ-না প্রশ্নের ব্লকগুলো করা হয়েছে ষড়ভুজ আকারের, যাতে খাপে খাপে বসে যায় ওই লুপ ব্লকের ষড়ভুজ খুপড়িতে।

দেখতেই পাচ্ছেন, সিনট্যাক্স এরর করা, অর্থাৎ ভাষার নিয়ম ভাঙ্গার জো-টি নেই। জমিটা কতটা নিচু দেখতে পাচ্ছেন তো নিশ্চয়ই।

তাছাড়া, ইংরিজি হরফ পড়তে পারে না অথচ প্রোগ্রামিং শিখতে বসেছে, এমন কাউকে দেখেছেন কি? 'স্ক্র্যাচ' যেহেতু ছবির উপর কিছু নির্দেশ মাত্র, নির্দেশগুলোকে অনুবাদ করলেই অন্য যেকোনো ভাষায় 'স্ক্র্যাচ' শেখা যায়! এবং অনুবাদ হয়েওছে অনেক ভাষায়। ইংরাজি না জানাটা প্রোগ্রামিং শিখতে আর কোনো বাধাই নয়!

এসবের পরেও আটকে গেলে উদ্ধার করার জন্য বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ খুদে শিক্ষক রয়েছে। আবার অপরদিকে ফাটাফাটি কিছু নামিয়ে দিলে তারিফ করার লোকেরও অভাব নেই। যেহেতু পুরো খেলাটাই, থুড়ি কোডিংটাই অনলাইন করা হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ার সব হাতিয়ারই মজুত রয়েছে। শেয়ার, কমেন্ট, রি-শেয়ার এবং প্রত্যেকটা প্রজেক্টই যেহেতু ওপেন-সোর্স, তাতে নিজের মত রিমিক্স করা — সবই চলে 'স্ক্র্যাচ'-সমাজে। এবং শেয়ার করাকে রীতিমত উৎসাহ দেওয়া হয়। যেসব প্রজেক্টকে সবথেকে বেশি লোকে আপন করে রি-শেয়ার করে, তাদের হোমপেজে ফীচার করা হয়। ইন্টেলেকচুয়াল সম্পত্তি মিছিমিছি আগলে রাখার প্রবণতা যাতে না গড়ে ওঠে, সেদিকে সজাগ থেকেছেন 'স্ক্র্যাচ'-এর স্রষ্টারা।

এর একটা অপ্রত্যাশিত প্রভাব দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। কোলাবরেশন বা যৌথ উদ্যোগ, শিক্ষার জগতে যেটা প্রায় নেই বললেই চলে। সায়মিন্দুর কথায়, "আমাদের শিক্ষাটা আসে উপর থেকে – বয়স্ক, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের থেকে। সমবয়েসীদের কাছে যে শেখার সুযোগ আছে, আমরা সেটা ভেবেই দেখিনা। অথচ, বড় হলে তখন কোলাবরেশনের জয়জয়কার।" এই

কোলাবরেশনের কিছু অভাবনীয় দৃষ্টান্ত দেখা গেছে 'স্ক্র্যাচ'-সমাজে। যেমন, ইংল্যান্ড-এর একটা পনের বছরের মেয়ে কিছু মজাদার অ্যানিমেশন বানালো। তাই দেখে ইংল্যান্ডেই একটা দশ বছরের মেয়ে তাকে অনুরোধ জানালো, আমার প্রজেক্টের জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরী করে দাও প্লিজ। দুজনে মিলে একটা "কোম্পানি" খুলে বসলো, যাদের দাবি তারা উচ্চ মানের ভিডিও গেম বানিয়ে দিতে পারে। তাতে যোগ দিল, আমেরিকার নিউ জার্সিতে থাকা চোদ্দ বছরের একটা ছেলে। তার প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষমতা দিয়ে সে জায়গা করে নিল কোম্পানিতে। শিশুদের জগতে এমন বাস্তবজীবনের প্রস্তুতি সাধারণ স্কুলের বাঁধাধরা কারিকুলামের মধ্যে সম্ভবই নয়।

কম্পিউটার যে একদিন বাঁধাধরা কারিকুলামকে ছিন্নভিন্ন করে শিক্ষার জগতে নতুন পথের নির্দেশ করবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন MIT মিডিয়া ল্যাবেরই কিছু পথিকৃত। সিমোর প্যাপার্ট তার মধ্যে অন্যতম।

'স্ক্র্যাচ' হয়ত সাম্প্রতিক একটা ঘটনা, কিন্তু তার গোড়াপত্তন করে গেছিলেন প্যাপার্ট। প্যাপার্টের দূরদর্শী চিন্তাভাবনা থেকেই আজকের এই নতুন শিক্ষাপ্রদানের মাধ্যমে আসা গেছে। তবে তার কথা আরেকদিন বলবো। আপাতত স্ক্র্যাচ-এর দুনিয়ায় ছেড়ে দিলাম আপনাদের। দেখুন তো, যে গল্পটা এদ্দিন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, সেটাকে স্ক্র্যাচের সাহায্যে বলতে পারেন কিনা।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন

http://bigyan.org.in/2015/11/02/programming-is-fun/

(লেখাটি ৯-ই নভেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)

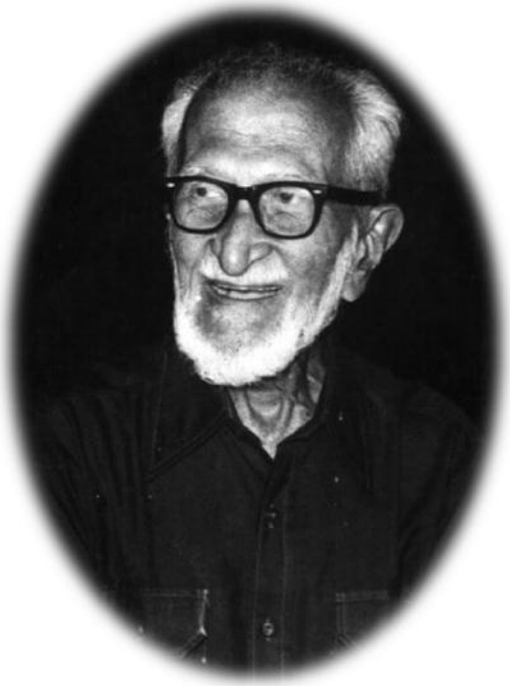

পাখিপ্রাণ সালিম আলি

মানস প্রতিম দাস

আকাশবাণী কলকাতা

১৯৫০ সাল। সুইডেনের উপ্‌সালাতে বসেছে পক্ষীবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। প্রথম অধিবেশন শুরু হতে তেমন দেরি নেই, পৌঁছে গিয়েছেন প্রায় সবাই। একজন ভারতীয় অবশ্য তখনও পৌঁছন নি। কী হবে? কোথাও আটকে গেলেন নাকি? অনুপস্থিত থাকবেন? এমন ভাবনা যখন ঘুরছে আয়োজকদের মনে তখন হঠাৎ মোটরসাইকেলের গর্জন। একটা সানবীম মডেল ব্রেক কষে দাঁড়াল সভাঘরের বাইরে। নামলেন সেই ভারতীয়। মুহূর্তের মধ্যে খবর চাউর হয়ে গেল যে ভারত থেকে সোজা বাইকে করে উপসালা পৌঁছেছেন এক ভারতীয় পক্ষীবিদ! যার কথা হচ্ছে তিনি সালিম আলি। চুয়ান্ন বছর বয়সে ফিল্মি হিরোর মত বাইকে করে আবির্ভূত হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যাঁর। এতটাই আকর্ষণ মোটরবাইকের প্রতি যে একটা মডেল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন না তিনি, শুধু হার্লে-ডেভিডসনেরই তিন রকম মডেল ছিল তাঁর কাছে। এছাড়াও একটা করে ডগলাস, স্কট, নিউ হাডসন এবং জেনিথ মোটরবাইক চালিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। অবশ্য সানবীমের গল্পটা পুরোপুরি সত্যি নয়। ভারত থেকে গোটা পথ ঐ বাইকে পাড়ি দেন নি তিনি। বম্বে থেকে জাহাজে করে ইউরোপে আনান বাইকটা, উদ্দেশ্য ছিল সম্মেলনের আগে সেটাতে করে ইউরোপ চক্কর দেওয়া। এই কাজ করতে গিয়ে ফ্রান্সে ছোটখাটো দুর্ঘটনায় পড়লেন, জার্মানীর মসৃন, বাঁধানো রাস্তায়

আছাড়ও খেলেন বেশ কয়েকবার। তাতে কী? ভালবাসার জন্য কতকিছু করা যায়, হাত-পায়ে চোট তো সামান্য ব্যাপার। প্রবন্ধের শুরুতে ঝাঁকুনি খেয়ে পাঠক হয়ত প্রশ্ন তুলে ফেলেছেন, সালিম আলি কোনটা বেশী ভালবাসতেন, পাখি না মোটর বাইক? জানা নেই উত্তরটা, তবে বাকি প্রবন্ধ তাঁর পক্ষীপ্রেমের আলোচনায় নিবেদিত।

যে কোনো শাখার একনিষ্ঠ গবেষক সেই শাখার গভীরতা বুঝতে তার ইতিহাস পাঠ করেন নিবিড়ভাবে। নিজের উপলব্ধি পৌঁছে দেন সাধারণ মানুষের কাছে । প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কাজটা করেছিলেন 'আ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি'-র মাধ্যমে। সালিম আলি ব্যবহার করেছেন তাঁর লেখনী ও বিভিন্ন বক্তৃতার মঞ্চ। ষোড়শ আজাদ মেমোরিয়াল লেকচারে সালিম আলি তুলে আনলেন ভারতবর্ষের পক্ষীচর্চার ইতিহাস। মুঘল আমলের আগে পাখিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার বিক্ষিপ্ত চেষ্টা হলেও সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চেষ্টা শুরু হয় বাবরকে দিয়ে। সালিম আলির মন্তব্য, চালু ধারনাকে আশ্রয় করে পাখির বর্ণনা তৈরি করতেন না সম্রাট বাবর। একটা উদাহরণ – শীতকালে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে

সালিম আলির পক্ষী-পর্যবেক্ষণের কৌশল ছিল মুঘল সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীরের মত – দ্রুত ধারণা তৈরি করা কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠা বজায় রাখা।

বাঁধানো রাস্তায় আছাড় খাওয়া এবং হাতপায়ে চোট পাওয়া সত্ত্বেও সালিম আলি দেশ বিদেশে - মোটরবাইক সফরে বেরিয়ে পড়তেন।

মোনাল ফিজ্যান্ট (monal pheasant) নেমে আসে পাহাড়ের পাদদেশে। ওড়ার পথে ফিজ্যান্টের দল যদি কোনো আঙুরক্ষেতের উপর দিয়ে যায়, তখন চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ে যায় সেখানেই। বাবর লিখছেন, 'এইসব কথার সত্যতা ঈশ্বরই জানেন। আমি বুঝি যে এর মাংস বেশ সুস্বাদু।' ইতিউতি কথায় যে বাবরের আস্থা নেই এবং পক্ষীকুলের বর্ণনায় যে সেগুলোকে কোনো স্থান দেননি তিনি, এটা তার দৃষ্টান্ত।

তবে মুঘল সম্রাটদের মধ্যে যিনি পাখি সম্পর্কিত জ্ঞানের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন নিবিড়ভাবে, তিনি জাহাঙ্গীর। তার সম্পর্কে বলা হয়, সম্রাট না হয়ে তিনি যদি কোনো ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের প্রধান হতেন তবে হয়ত অনেক বেশি সুখী হতেন। এমনই ছিল তার পক্ষীপ্রেম। রাজসভায় তিনি স্থান

দিয়েছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর ওস্তাদ মনসুর-কে। তাঁর কাজ ছিল নতুন পাখির ছবি আঁকা। জাহাঙ্গীরের আগ্রহ জানতেন তাঁর সাম্রাজ্যের সবাই, এমনকি বিদেশীরাও। তাই নজরানা হিসাবে তারা নিয়ে আসতেন তাদের এলাকার বিশেষ প্রজাতির পাখি। সেগুলো সম্রাটের হাতে পৌঁছনো মাত্রই তিনি মনসুরকে নির্দেশ দিতেন পাখির নিখুঁত ছবি আঁকতে। সৌভাগ্যক্রমে, এর মধ্যে বেশ কিছু ছবি আজও সংরক্ষিত রয়েছে। কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরেও সম্ভবতঃ রয়েছে তার নমুনা। ছবির পাশাপাশি পাখির চেহারা, বাসস্থান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করতেন জাহাঙ্গীর। সেইসব বর্ণনা ধরা রয়েছে তাঁর স্মৃতিকথায়। ১৬২৪ পর্যন্ত চলে জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা রচনা। এই সময়ের মধ্যে কত যে পাখির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সালিম আলি জানিয়েছেন যে তাঁর দরবারে ডোডো পাখিও পৌঁছেছিল। তবে সেটা ১৬২৪ সালের পরে। ফলে সেটার ছবি থাকলেও স্মৃতিকথায় কোনো উল্লেখ নেই।

জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য বা আরো পরে মুঘল সাম্রাজ্য ছারখার হওয়ার পরে সম্রাটের সংগৃহীত বহু নমুনা বিশ্বের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ে। স্রেফ লুটের খেলা চলছিল তখন। যিনি পাখির নমুনা চুরি করছেন, তিনি হয়ত জানেনও না তার গুরুত্ব। লুটেরাদের দলে অবশ্যই ছিল ব্রিটিশরা। কিন্তু তাঁদের অপরাধের পাশাপাশি গুনপনাও কিছু কম ছিল না। ব্রিটিশ রাজপুরুষদের অনেকেরই আগ্রহ ছিল পাখিদের সম্পর্কে তথ্যভান্ডার গড়ে তোলায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতে প্রথম পাখি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক সংকলন তৈরী করেছিলেন ব্রিটিশ সাহেব জার্ডন। ১৮৬২ এবং ১৮৬৪ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'বার্ডস অফ ইন্ডিয়া'-র দুটো খন্ড। এর পরে যে খামতি ছিল তা পূরণ করেন দুজন ভারতীয় - সালিম আলি এবং সিডনি ডিলো রিপলে। দশ খন্ডে তাঁরা প্রকাশ করেন 'হ্যান্ডবুক অফ দ্য বার্ডস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান'। প্রকাশকাল ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩। এতগুলো খন্ড প্রকাশের পরও, যে বিষয়টা সালিম আলিকে চির-অতৃপ্ত রেখেছিল তা হলো পাখিদের স্থানীয় নামের নির্ভরযোগ্য তালিকা সম্পূর্ণ করতে না পারা। এর অভাবে জনপ্রিয় বই যে তৈরী করা মুশকিল তা বিলক্ষণ জানতেন তিনি।

জনপ্রিয়করণের এই আগ্রহ যে সারা জীবন তাঁর মধ্যে ছিল, তার বহু প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। পরিণত বয়েসে একবার তিনি প্রতিষ্ঠিত পক্ষীবিদ রিপলেকে বেশ রাগ করেই লেখেন যে পক্ষীচর্চার সবটাই যদি কাঠ-কঠিন নামকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তিনি ছেড়েই দেবেন বিষয়টা। অরণ্যে পাখিদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ অধ্যয়ন ছেড়ে তিনি এমন ট্যাক্সোনমির যুদ্ধ করতে আগ্রহী নন। মজার কথা, প্রাণীবিজ্ঞানে সালিম আলির প্রশিক্ষণ মাত্র এক বছরের।

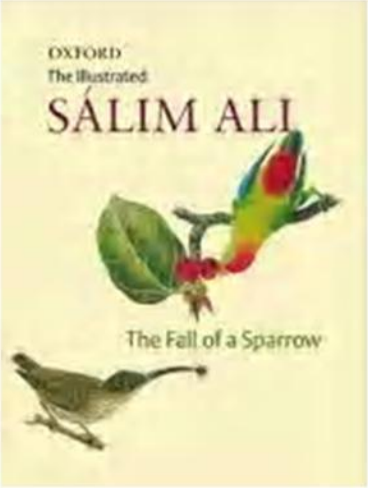

১৯১৭ সালে দুটো কলেজে একসাথে ভর্তি হন তিনি। একটাতে পড়াশোনার বিষয় ছিল আইন ও হিসাবশাস্ত্র। অন্যটাতে প্রাণীবিজ্ঞান। দুটোই সম্পূর্ণ করেন তিনি। অবশ্য শুধু সময়ের 'দৈর্ঘ্য' দিয়ে এই সময়টাকে মাপলে চলবে না। এই সময়েই তিনি যুক্ত হতে শুরু করেন বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি

সোসাইটির সঙ্গে। তার কেরিয়ার গঠিত হতে শুরু করে এই জায়গা থেকে। তবে ওই সোসাইটির সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় যে নিতান্ত শৈশবে, তা তো পাঠক মাত্রেই জানেন। ঘটনাটা এইরকম। একটা চড়ুই পাখি মেরেছিল ছোট্ট সালিম, তাঁর খেলনা এয়ারগান দিয়ে। সোসাইটির সম্পাদক মিলার্ড সাহেব সেই পাখি দেখে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। পাখির শরীরে ব্যতিক্রমী রঙের বিস্তার দেখে মনোযোগী হলেন তিনি। চিহ্নিত করলেন পীৎকন্ঠ চড়ুই হিসাবে। এরপরে, বলা যায় পুরস্কার হিসাবে, সোসাইটির stuff করা পাখির সংগ্রহ দেখালেন। এই বিশেষ চড়ুইয়ের কথা সালিম আলি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'দ্য ফল অফ আ স্প্যারো' তে। মৃত চড়ুই তাঁকে পাখির জগতের দরজা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রির সঙ্গে তাঁর যোগ যে কতটা নিবিড় ছিল তা বোঝাতে ১৯৮৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করব। প্রবন্ধের শিরোনাম 'বায়োলজি আন্ডার দ্য রাজ'। সোসাইটির শতবর্ষ পূর্তিতে এর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লেখা হয়েছে (অনুবাদ) :

"১৯৩০ থেকে বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির কাহিনী নির্ধারিত হয়েছে সালিম আলি নামে এক ক্ষীনদেহীর দ্বারা। কোনো ডিগ্রী নেই, জীববিজ্ঞানের প্রশিক্ষণও দূর অস্ত, তিনি বার্মায় কাঠ ব্যবসায়ীর পেশা ছেড়ে নিজের জীবন নিয়োজিত করেন পক্ষীচর্চায়। আজ ৮৭ বছর বয়সেও তিনি সমান সক্রিয় এবং দেশে বিদেশে সোসাইটির সঙ্গে তাঁর নাম সমার্থক। তাঁর ভূমিকার তাৎপর্য দুরকম: প্রকৃতিবিদ হিসাবে এবং প্রশাসক রূপে। যদিও প্রানীদের সমীক্ষার সাথে মূলত যুক্ত ছিলেন তিনি, প্রান্তরে-অরন্যে গিয়ে প্রাণীর আচরণ ও বাস্তুতন্ত্রের সংস্কারমুক্ত, সরল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ইতিহাস চর্চার প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলেন। বিশেষ করে বাবুই পাখির সামাজিক জীবন সম্পর্কে তাঁর গবেষণা, মুক্ত ভাবনা এবং স্পষ্টতার দিক দিয়ে কিছু বছর আগে great crested grebes এর উপর জুলিয়ান হাক্সলির করা গবেষণার সঙ্গে তুলনীয়।"

তবে সোসাইটির পুরোভাগে থাকাকালীন কিছু বিতর্কেও জড়িয়ে পরেন তিনি। স্বাধীনতার পরে

> প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে সালিম আলি ভরতপুরকে চাষের ক্ষেতে পরিবর্তিত হওয়া থেকে বাঁচান।

যখন রাজস্থানের ভরতপুরে মহারাজার অধীনে থাকা কেওলাদেও ঘানা বার্ড স্যাংচুয়ারি ভেঙেচুরে চাষের ক্ষেত বানানোর জন্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষ আন্দোলন শুরু করে, তখন তিনিই প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে বাঁচান ভরতপুরকে। অবশ্য মহারাজার শিকারের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। প্রজননের ঋতুতে শিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা পড়ে। পাখির জন্য এলাকার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যেতেও দ্বিধা করেন নি তিনি। অবশ্য নেহাৎ আবেগের বশে একাজে লিপ্ত হননি সালিম আলি। তিনি দেখান যে ভরতপুর পার্শ্ববর্তী এলাকাকে দেয় অনেক কিছু - গবাদি পশুর খাবার, জ্বালানি কাঠ, ফল এবং বাড়ির ছাউনির জন্য খড় ইত্যাদি। চাষের ক্ষেত তৈরি হলে এর থেকে বেশি উপকৃত যে নাগরিকরা হবেন না, তা বোঝে

সরকার। পাশ হয় ভরতপুরের অরণ্য ও জলাভূমি অটুট রাখার সিদ্ধান্ত।

এই ভরতপুরকেই ন্যাশনাল পার্ক করার আগ্রহ দেখান সালিম আলি। এই আগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয় দাবি - গবাদি পশুকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না এই এলাকায়। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে সোসাইটির করা এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে গবাদি পশু না ঢুকলে এক বিশেষ ধরেণের আগাছা বাড়ছে হু হু করে। এরা জলের মধ্যে মাছের জীবনকেও সীমিত করে দিচ্ছে। ফলে মাছের সংখ্যা কমছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে কমে যাচ্ছে জলের পাখি। এই সমীক্ষায় সহযোগী হয় ইউনাইটেড স্টেটস ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিস। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী সচিব ডেভিড চালিনর ১৯৮০ সালে আসেন এই সমীক্ষায় অংশ নিতে। হতবাক হয়ে তিনি চিঠি লেখেন রিপলেকে। রিপলে বিষয়টা নিয়ে লেখেন সালিম আলিকে। প্রায় এক দশক চলার পর ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয় সোসাইটির প্রতিবেদন, সালিম আলির মৃত্যুর (১৯৮৭) পর। গবাদি পশুর অভাবে ভরতপুরে পাখির দৈন্যদশা পরিষ্কার হয়।

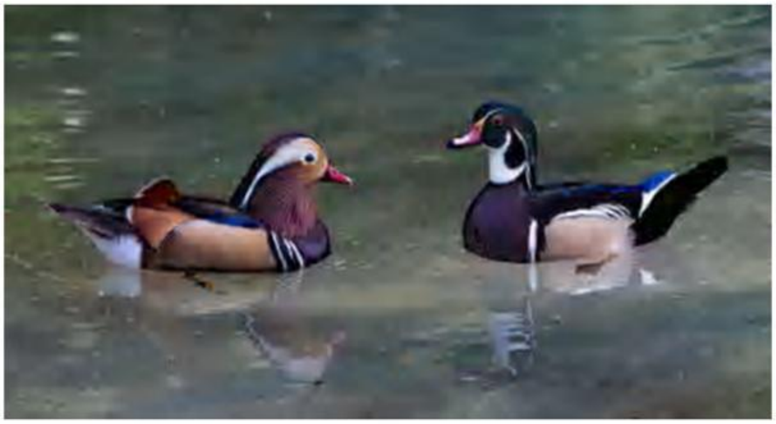

ম্যান্ডারিন এবং উড হাসের ছবিটি তুলেছে অনিন্দিতা সরকার।

সালিম আলি সারা জীবন নিজেকে দেখেছেন একজন শখের বা অ্যামেচার পক্ষীবিদ হিসাবে। অথচ তিনিই তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন পেশাদারিত্বের সুউচ্চ মান। বিজ্ঞানী মাধব গ্যাডগিল-এর মতে তাঁর পর্যবেক্ষণের কৌশল ছিল মুঘল সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীরের মত – দ্রুত ধারণা তৈরি করা কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠা বজায় রাখা। হয়ত আবেগের বশে কোথাও-কোথাও তিনি কিঞ্চিৎ সরে গিয়েছেন যুক্তির নিগড় থেকে। তবে তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময় ছিল পাখিদের সংরক্ষণ। কেবল সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি নয়, নিখাদ অর্থনৈতিক মূল্যে পাখি যে কত দামী তা বুঝতেন তিনি, বুঝিয়ে গিয়েছেন আমাদের।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2015/11/13/salim_ali/

(লেখাটি ১৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল)।

প্রচ্ছদের ছবি: উইকিপিডিয়া

সালিম আলি (সালিম মইজুদ্দিন আব্দুল আলি)
জন্ম - ১২ নভেম্বর ১৮৯৬ মৃত্যু- ২০ জুন ১৯৮৭

লেখা দিতে হলে

বৈদ্যুতিন লোকবিজ্ঞান (Popular Science) পত্রিকা বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in)-এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে বিষয়ভিত্তিক লেখার জন্য আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানাই।

বিজ্ঞান-এ লেখা পাঠানোর আগে লেখক অবশ্যই রচনার নিয়মাবলীটি পড়ে দেখুন।

আমরা যে ধরণের লেখা পেতে আগ্রহী

- বিজ্ঞানের (ব্যাপক অর্থে – গণিত ইত্যাদি সহ) কোন ধারণা বা concept-এর সহজ এবং অভিনব ব্যাখ্যা। যা সহজে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না অথবা অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বর্ণনা করা থাকে না। লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা সাধারণ রচনাধর্মী লেখা পাঠাবেন না।
- কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু ঘটনা, যা পড়ে তাঁর গবেষণা ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। উইকিপিডিয়ার রচনামূলক ধাঁচের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং সেই আবিষ্কারের তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত লেখাগুলো সাধারণত সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়।
- কোন গবেষণার বিষয়ের বর্ণনা যা পাঠককে সেই বিষয়ে আরো জানতে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে খুব বেশী টেকনিক্যাল টার্ম না ব্যবহার করা বিধেয়।
- নিজে কর – সহজে বাড়িতে বা স্কুলে তৈরী করা যেতে পারে বা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন কোন বিষয়!
- বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যা, যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে/ভাবিয়েছে তার বর্ণনা।
- বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় যা বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। এইধরণের বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কাম্য। কেবল মাত্র সমস্যার সাধারণ বর্ণনা যা উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে তা নয়।
- বিজ্ঞান বা অঙ্কের মজার ধাঁধা।

কিছু নিয়মকানুন

- লেখাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মেটাফিজিক্স জাতীয় লেখা পেতে আগ্রহী নই আমরা।
- রাজনৈতিক বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা দয়া করে পাঠাবেন না।
- সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবাচিত হবে।
- লেখাতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস উল্লেখ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও লেখার শেষে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা বা ভিডিও-র লিঙ্ক দিলে কৌতূহলী পাঠকের উপকারে আসবে।

লেখার খুঁটিনাটি

- প্রতিটি লেখা বাংলা হরফে (Unicode) Google doc ফাইল হিসেবে ই-মেল-এ জুড়ে পাঠাতে হবে। ছবির ক্ষেত্রে best possible resolution-এ পাঠাতে হবে।
- ই-মেল-এ বিষয় এবং কোন বিভাগের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন। সেই সাথে আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানান।
- ই-মেল করুন bigyan.org.in@gmail.com-এ।